শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা

প্রকাশক

বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স্ লিঃ

স্বত্বাধিকারী—**আশুতোষ লাইব্রেরী**

৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা,

পাটুয়াটুলী, ঢাকা

দ্বিতীয় সংস্করণ

১৩৪৫

মূল্য বারো আনা

প্রিণ্টার—শ্রীত্রৈলোক্যচন্দ্র সুর

আশুতোষ প্রেস

ঢাকা

কোন্ সুদূর অতীতে মানুষের মনে বিজ্ঞান অনুশীলন করিবার আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল, আজিও কেহ তাহা সঠিকরূপে নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় নাই। মানুষের মনে যে কৌতূহল-বৃত্তি চির-জাগরূক থাকিয়া, মানুষকে নিত্য নব অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে সাহায্য করিতেছে, তাহা হইতেই একদা হয়ত মানুষের মনে প্রকৃতির রহস্য ভেদ করিবার ইচ্ছা জন্মিয়াছিল। এবং প্রকৃতির অপরূপ রহস্য ভেদ করিতে গিয়াই মানুষের প্রয়োজন হইয়াছিল—বিজ্ঞান বা বিশেষ জ্ঞানের। বিজ্ঞান অনুশীলনের ইহাই হয়ত ইতিহাস। কত প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া, কত ঝড়ঝঞ্ঝার সহিত সংগ্রাম করিয়া, বিজ্ঞান যে বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহা প্রত্যেকেরই জানা প্রয়োজন। ইহা জানিতে হইলে, যে-সমস্ত আত্মভোলা তীক্ষ্ণধী মনীষী, আপন অধ্যবসায় বলে, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন করিয়া, আধুনিক বিজ্ঞানের বনিয়াদ সুদৃঢ় করিয়া গিয়াছেন, সেই সমস্ত জ্ঞান-বীরের জীবনী এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নূতন তত্ত্ব আবিষ্কারের কাহিনী আমাদের শ্রদ্ধাভরে পাঠ করিতে হইবে; নহিলে শুধুমাত্র বিজ্ঞান ও গণিতের সূত্র মুখস্থ করিয়া বিজ্ঞান পাঠের প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হইবে না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান কর্ণধার পরলোকগত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রচেষ্টায় প্রবেশিকা পরীক্ষার অন্যতম অবশ্য-পাঠ্যরূপে মাতৃভাষার

সাহায্যে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। কোমলমতি শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান্ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে বৈজ্ঞানিকগণের জীবনীও পাঠ করিতে পারে, কতকটা সেই উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থ রচিত হইল। অতি সহজ ভাষায়, কয়েকজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকের জীবনী ও তাঁহাদের আবিষ্কার-কাহিনী এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। যদি আমাদের দেশের কিশোর কিশোরীগণ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া অতি সামান্য পরিমাণেও উপকৃত হয় তবে আমার শ্রম সম্পূর্ণ সার্থক মনে করিব।

গ্রন্থে ত্রুটীবিচ্যুতি থাকা অসম্ভব নহে। যদি কোন পাঠক-পাঠিকা ইহা আমাকে জানান, তবে তাহা অতি ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইবে।

এই গ্রন্থ রচনায় আমাকে আমার কতিপয় শিক্ষা-দান-ব্রতী বন্ধু নানাভাবে উৎসাহ দিয়াছেন—তাঁহাদের নিকট আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আশুতোষ লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারিগণ এই গ্রন্থ প্রকাশে সর্ব্বপ্রকার যত্ন লইয়াছেন—এজন্য তাঁহাদেরও আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ইতি

ঢাকা,
রাস-পূর্ণিমা.
১৩৪৩ সন। } শ্রীমনোরম গুহ-ঠাকুরতা

পিতৃদেবের শ্রীচরণোদ্দেশ্যে

বিজ্ঞানের গল্প

বিজ্ঞানের জন্ম-রহস্য

মানুষের মনে কৌতূহল চিরদিনই অত্যন্ত প্রবল। আর তারই ফলে মানুষের মনে একদিন জন্ম হয়েছিল নানা বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করবার আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত মানুষ বহু চেষ্টা ক'রেও স্থির কর্‌তে পারেনি কোথায় গিয়ে জ্ঞান-রাজ্যের সীমা শেষ হয়েছে। তাই আদিম যুগ থেকে সুরু করে, এখনও মানুষ তীর্থ-যাত্রীর মত জ্ঞান-রাজ্যের পথে ছুটে চলেছে। মানুষের এই যাত্রা কখনও শেষ হবে কিনা—তা কেউ-ই বল্‌তে পারে না।

রাতের বেলা আকাশের বুকে তারাগুলোকে মিট্‌ মিট্‌ করে জ্বল্‌তে দেখে—তোমরা হয়ত মনে মনে ভাবো—ওরা কারা? কেনই বা ওরা আকাশের বুকে অত উঁচুতে থেকে অমনভাবে মিট্‌মিট্‌ করে জ্বল্‌ছে। কেমন ভাবে, কোন্‌ জিনিষকে অবলম্বন করে ঐ মহাশূন্যে অত উঁচুতে ওরা ঝুল্‌ছে? আকাশটা ত চারদিকেই ফাঁকা, তবে কেমন করে ওরা ওখানে স্থিরভাবে রয়েছে—কেন স্থানচ্যুত হয়ে খসে মাটীতে পড়ে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে না! চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ যা কিছু তোমরা আকাশের বুকে দেখতে পাও—সবাকার সম্বন্ধেই এই এক প্রশ্ন হয়ত তোমাদের মনে জেগে ওঠে। কেমন তাই নয় কি? শুধু কি এ সব

সম্বন্ধেই জান্‌বার জন্য তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগে ? না—তা নয়। প্রকৃতির সমস্ত রহস্যের কথাই হয়ত তোমরা জানতে চাও। আকাশের বুকে সপ্তবর্ণে রঞ্জিত রামধনু দেখে তোমরা হয়ত মনে মনে ভাবো—এর গায়ে এমন অপূর্ব্ব বর্ণচ্ছটার সমাবেশ হোলো কোত্থেকে ?...ঘন কালো মেঘের বুকে বিদ্যুতের চম্‌কানো দেখে তোমরা হয়ত ভয়ে বিস্ময়ে একেবারে অবাক হয়ে যাও !......দিন রাত্রি কি করে হয় ? গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত এইসব ঋতুগুলো কি করে পর্য্যায়ক্রমে পরিবর্ত্তিত হয়ে প্রত্যেক বছরই ঠিক একই সময়ে পৃথিবীতে এসে উপস্থিত হয় ?......মানুষকে মরতে দেখে তোমরা হয়ত মনে মনে ভাবো—কেন এরা মরে ? কোন রকমে এদের যদি একেবারে অমর করে রাখা যেতো ! প্রকৃতির রহস্যের এই সব কথা ভাবতে ভাবতে তোমরা আশ্চর্য্য হয়ে যাও—আর ব্যাকুল হয়ে ওঠ এর কারণগুলো জান্‌বার জন্য।

পৃথিবীর সব মানুষেরই অবস্থা একদিন তোমাদের মতই ছিল। তারাও এসব রহস্যের কোন খোঁজ খবরই রাখতো না। তারপর ক্রমে এনদা এইসব রহস্য মানুষের মনে এক বিরাট প্রশ্ন জাগিয়ে তুললো। মানুষ এসব রহস্যের সমাধান করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌লো।

আর তাই থেকে প্রয়োজন হোলো—বিজ্ঞান বা বিশেষ জ্ঞানের।

বিজ্ঞানের জন্মের পর থেকে যুগ যুগান্তর অতীত হয়ে গেছে—কিন্তু আজ পর্য্যন্ত প্রকৃতির অসীম রহস্যের কতটুকু মানুষের কাছে ধরা দিয়েছে! আদিম মানবের কাছে প্রকৃতি যতটা দুর্ব্বোধ্য ছিল আজ বিজ্ঞান অনুশীলনের ফলেও প্রায় ততটাই দুর্ব্বোধ্য রয়ে গেছে। এবং বিজ্ঞান চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই যেন এই জটিলতা আরও বেড়ে যাচ্ছে। পরীক্ষা দ্বারা কতকগুলো সমস্যার সমাধান করে, মানুষ হয়ত সত্যে পৌঁছুতে পেরেছে। কিন্তু ফলে এমন সব সহস্র সহস্র নূতন সমস্যা এসে মানুষের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে যার কোন মীমাংসা আজও সম্ভব হয়নি। কখনও হবে কিনা—তা-ও বলা যায় না।

প্রাচীন যুগে মানুষ যখন বিজ্ঞান চর্চ্চা করতে শেখে নি—তখন তারা প্রকৃতির মধ্যে ভগবানের মহিমার অপূর্ব্ব বিকাশ লক্ষ্য করে ভক্তি-প্রণত শিরে একে দেবতা বলেই পূজো করেছে। আমাদের এই ভারতবর্ষে, প্রাচীন যুগে আর্য্য ঋষিরা ঝড়, বৃষ্টি, আকাশ, বাতাস, সূর্য্য, আগুন, জল প্রভৃতি প্রাকৃতিক রহস্যকে দেবতারূপে কল্পনা করে তাদের পূজো করতেন। শুধু আমাদের দেশেই নয় পৃথিবীর বহু দেশেই

প্রাচীন যুগে এইরূপ পূজো করবার রীতি প্রচলিত ছিল। ক্রমে যখন মানুষের মনে প্রকৃত সত্য জানবার একটা অদম্য ইচ্ছা জেগে উঠ্‌লো—তখনই তারা অগ্রসর হোল এই সব চিরন্তন রহস্য ভেদ করতে। কিন্তু সেই প্রাচীন যুগ থেকে বহু বহু কাল পরে আজ আবার মানুষ প্রকৃতির অসীম রহস্য ভেদ করতে গিয়ে ব্যর্থমনোরথ হয়ে—প্রাচীন কালের মানবেরই মত প্রকৃতির মাঝে ভগবানের মহিমার বিকাশ লক্ষ্য করে বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছে।* কিন্তু তা বলে যে, মানুষ ভগ্নোদ্যম হয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা পরিত্যাগ করেছে তা নয়। পরীক্ষার পর পরীক্ষা করে মানুষ নব নব আবিষ্কার দ্বারা জ্ঞানের রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করে যাচ্ছে। জ্ঞানের সীমা বৃদ্ধি করে যাচ্ছে সত্য ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মানুষকে আবার নূতন নূতন সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। জানিনা, মানুষের পক্ষে কখনও প্রকৃতির অনন্ত রহস্য সম্পূর্ণরূপে উদ্‌ঘাটিত করা সম্ভবপর হবে কিনা !

* সুপ্রসিদ্ধ আমেরিকান্ পদার্থবিদ্যা-বিদ্ Dr. Compton বলেছেন, "Modern Physics gives place to God." ইনি ১৯২৭ সালে পদার্থবিদ্যায় মৌলিক আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন।

গ্যালিলিও

অতীতের বৈজ্ঞানিকদের কাহিনী ধারাবাহিক ভাবে সঠিকরূপে বলা কঠিন। প্রাচীন যুগের অনেক কিছুই আমাদের কাছে অজ্ঞাত। কারণ সে যুগে আজকালকার মত সব কিছুই লিখে রাখ্‌বার রীতি প্রচলিত ছিল না। সুতরাং এ যুগের বৈজ্ঞানিকদের কথাই তোমাদের কাছে বল্‌বো।

এ যুগের বৈজ্ঞানিকদের কথা বল্‌তে হলে, আমাদের সর্ব্বপ্রথম মনে পড়ে গ্যালিলিওর নাম। আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মদাতা এই গ্যালিলিও। পরীক্ষাদ্বারা বিজ্ঞানের কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছবার প্রণালী—যা এ যুগে সর্ব্বশ্রেণীর বৈজ্ঞানিকেরাই অনুসরণ করে থাকেন—সে প্রণালীও গ্যালিলিওই প্রথম প্রচলিত করেন। গণিত-শাস্ত্রের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার রীতিও তিনিই আবিষ্কার করেছিলেন।

আজ থেকে প্রায় তিন শ' পঁচাত্তর বছর আগে ইটালীর এক অতি দরিদ্র পরিবারে এঁর জন্ম হয়। পিতা দরিদ্র ছিলেন সত্য—কিন্তু ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তোল্‌বার ইচ্ছাটা তাঁর অন্যান্য পাঁচজনের মতই ছিল। তাঁর ইচ্ছা ছিল ছেলে চিকিৎসা-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করে চিকিৎসক হয়। কারণ সে যুগে চিকিৎসকদের ভারী সম্মান ছিল। কিন্তু মানুষের নিজের ইচ্ছায়ই কি সব সময় সব কাজ হতে

পারে ? ছেলের চিকিৎসা-বিজ্ঞান শেখ্‌বার দিকে ঝোঁক মাত্রও ছিল না। তাঁর প্রবল অনুরাগ ছিল জ্যোতিষ ও গণিতশাস্ত্র শেখ্‌বার দিকে। সুতরাং পিতার ইচ্ছা অপূর্ণই রয়ে গেল।

সে সময় ইটালীর সব চেয়ে বড় বিশ্ববিদ্যালয় ছিলো পাইসা (Pisa) নগরীতে। গ্যালিলিও এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্র ছিলেন। ছাত্রাবস্থায়ই তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। অধ্যাপকেরা গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয় যেমন বরাবর ক্লাসে পড়ান তেমনিভাবেই পড়িয়ে যেতেন। ঐভাবে পড়িয়ে কিন্তু তাঁরা গ্যালিলিওর কাছ থেকে নিষ্কৃতি পেতেন না। তিনি তাঁদের প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে একেবারে ব্যতিব্যস্ত করে তুল্‌তেন। বল্‌তেন, "এটা কি," "ওটা কি," "প্রমাণ দিয়ে এসব সিদ্ধান্ত বুঝিয়ে না দিলে, আর যে-ই মেনে নিক্‌ আমি মান্‌বো না।" অধ্যাপকেরা চটে গিয়ে বল্‌তেন— "বাপু, তুমি একেবারে গোল্লায় গেছো। এ সব যে বড় বড় মহা-পণ্ডিতের সিদ্ধান্ত। তোমার আমার মত লোকের কথা ত আর নয়! সুতরাং তাঁদের কথাগুলো তোমার নির্ব্বিচারেই মেনে নেওয়া উচিত। এর কোন প্রমাণ চাওয়া তোমার মত বালকের পক্ষে ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছু নয়।" গ্যালিলিও শিক্ষকদের এই উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পার্‌তেন না। তিনি

গণিত ও জ্যোতিষের সব সিদ্ধান্তগুলোকে প্রমাণ কর্‌বার চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়্‌তেন।

তখনকার দিনে এই নিয়ম ছিল যে বড় বড় পণ্ডিতেরা যেসব সিদ্ধান্ত করে গিয়েছেন, এবং মানুষ চিরদিন ধরে যা শুনে আস্‌ছে তা-ই অভ্রান্ত সত্য। পরীক্ষাদ্বারা এর আর কোন প্রমাণের আবশ্যক করে না।

লেখাপড়া শেষ হবার পর গ্যালিলিও পাইসা (Pisa) বিশ্ববিদ্যালয়েই গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপকের কাজ পেলেন। অধ্যাপকের চাকুরীতে প্রবেশ করে তিনি নানা বিষয়ে গবেষণা ও পরীক্ষা করে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলোর সত্যতা নির্দ্ধারণ কর্‌বার চেষ্টায় সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করলেন।

অ্যারিষ্টটল নামে একজন প্রাচীন জ্ঞানী ব্যক্তি—সিদ্ধান্ত করে গিয়েছিলেন যে, কোন উঁচু জায়গা থেকে যদি ভারী ও পাত্‌লা দু'টো জিনিষ একসঙ্গে ফেলে দেওয়া যায়, তাহ'লে ভারী জিনিষটাই আগে মাটী স্পর্শ কর্‌বে। সবারই বিশ্বাস ছিল, যে, অ্যারিষ্টটলের প্রত্যেক সিদ্ধান্তই একেবারে নির্ভুল। গ্যালিলিও প্রচার করে দিলেন যে, অ্যারিষ্টটলের এই সিদ্ধান্তটী নির্ভুল নয় এবং তিনি তা পরীক্ষাদ্বারা সবাইকে বুঝিয়ে দিবেন। গ্যালিলিওর কথা শুনে সকলেই তাঁকে

পাগল বলে ভাবলো। সবাই বল্‌তে লাগ্‌লো অ্যারিষ্টটলের সিদ্ধান্ত যে ভুল বল্‌তে পারে, শুধু তাই নয়, আবার প্রমাণ দিয়ে তা বুঝিয়ে দিতে চায়, তার স্থান হওয়া উচিত পাগলা-গারদে। গ্যালিলিও মানুষের এসব বিরুদ্ধ মন্তব্য গ্রাহ্যের মধ্যেই আন্‌লেন না। তিনি নির্দ্দিষ্ট একটা দিনে সবার সাম্‌নে এটা ভুল বলে প্রমাণ করে দিবেন বলে স্থির করে ফেল্‌লেন।

পাইসা (Pisa) নগরীতে প্রকাণ্ড উঁচু একটা বুরুজ বা মিনার আছে। এই বুরুজটী অতি অদ্ভুত ভাবে তৈরী। এটা একদিকে হেলান। দেখেই মনে হয়, এই বুঝি কাং হয়ে পড়ে গেলো। কিন্তু তা তো হবার নয়। যুগ যুগান্তর ধরেই ওটা ঐভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

নির্দ্দিষ্ট দিনে গ্যালিলিও ছোট ও বড় দুইখণ্ড পাথর নিয়ে গিয়ে ঐ বুরুজের উপরে উঠ্‌লেন। নীচে কৌতূহলী জনতা অপেক্ষা করতে লাগলো। উপরে উঠেই গ্যালিলিও পাথর দুইখণ্ড একই সঙ্গে মাটীতে ফেলে দিলেন। দু'টোই এসে একই সময়ে মাটী স্পর্শ কর্‌লে। ব্যাপার দেখে কোথায় লোকে তাঁকে বাহবা দিবে তা নয় বরং উল্টো আরও তাকে গালাগাল দেওয়া স্নুরু করলো।

তোমরা চোখে দেখে—একটা ব্যাপার—সে যা-ই কেন হোক্ না—নিশ্চয়ই বিশ্বাস কর। কিন্তু এ ব্যাপারটা চোখে দেখেও কেউ বিশ্বাস করলে না। কারণ এ ব্যাপারটা যে জ্ঞানী অ্যারিষ্টটলের সিদ্ধান্তকে ভুল প্রমাণ করে দেয়। বরং একদল লোক এই ব্যাপারের জন্য তাঁর শত্রু হয়ে উঠ্‌লো। আজকাল অবশ্য এ নিয়মের পরিবর্ত্তন হয়েছে। আজকাল যে কোন দেশে একটা নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হলে, সমস্ত পৃথিবী শুদ্ধ আন্দোলিত হয়ে ওঠে। সেই বৈজ্ঞানিককে সম্মান জানাবার জন্য পৃথিবীর সব দেশে রীতিমত তাড়াহুড়ো পড়ে যায়।

আজ যেমন অতি সহজেই মানুষ বিশ্বাস করে, যে, এরোপ্লেনে চড়ে আকাশপথে উড়ে যাওয়া যায়, সে যুগে এ রকম ব্যাপার হলে চোখে দেখেও মানুষ কিছুতেই তা বিশ্বাস করতে পারতো না। হয়ত একে যাতুকরের যাতুবিদ্যা বা ভৌতিক অথবা দানা-দৈত্যির একটা কাণ্ড বলেই মনে করতো।

প্রথম জীবনে গ্যালিলিও নানা রকম আবিষ্কার করতে ভারী উৎসাহ বোধ করতেন। কিন্তু পরে এমন সব ব্যাপার ঘট্‌তে লাগলো যার ফলে তাঁর সমস্ত উৎসাহ একেবারে নষ্ট হয়ে গেলো।

তোমরা আজকাল যে পেণ্ডুলাম বা দোলকওয়ালা ঘড়ী দেখতে পাও, এ-ও গ্যালিলিওরই আবিষ্কার। খুব অল্প বয়সেই তিনি এই অতি প্রয়োজনীয় আবিষ্কারটী করেন। একদিন রাত্রিবেলা তিনি তাঁর বাড়ীর ছাদে বসে ছিলেন; এমন সময় দূরে দেখ্‌তে পেলেন—একটা গীর্জ্জার গায়ে ফ্রেমের মধ্যে ঝোলান আলোকটী ধীরে ধীরে ভারী চমৎকার ভাবে দুল্‌ছে। অনেকক্ষণ ধরে খুব মনোযোগের সঙ্গে তিনি ব্যাপারটাকে লক্ষ্য করলেন। লক্ষ্য করে দেখে, তিনি বুঝলেন, এই দোল্‌বার গতিটী অতি চমৎকার! আলোকটার বামদিকে যেতেও যতটা সময় লাগছে আবার সেখান থেকে ফিরে আস্‌তেও ঠিক ততটাই সময় দরকার হচ্চে। এই ব্যাপার লক্ষ্য করে, চমৎকার একটা বুদ্ধি তাঁর মাথার মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। তিনি মনে মনে ভাবলেন এই জিনিষটাকে কাজে লাগাতে পার্‌লে, সময় পরিমাপ করবার একটা চমৎকার যন্ত্র তৈরী করা যেতে পারে। যেই ভাবা সে-ই কাজ। অমনি তিনি ছাদ থেকে ঘরের ভিতর নেমে এলেন। এসেই, সূতোর সঙ্গে একটা ঢিল বেঁধে তাকে দেওয়ালের গায়ে ঝুলিয়ে দিয়ে, দোলা দিতে সুরু করলেন। আবার ঠিক ঐ একই ব্যাপার! এবারে তিনি নিশ্চিত হলেন যে, এ উপায়ে ঘড়ী বা সময়

পরিমাপ করবার যন্ত্র অতি অনায়াসেই তৈরী করে নেওয়া যেতে পারে।

অল্পদিনের চেষ্টায়ই তিনি একটা ঘড়ী তৈরী করে ফেললেন। এবার আর তাঁকে পায় কে? তাঁর উৎসাহ গেল বেড়ে, তিনি নূতন নূতন আবিষ্কারের কল্পনায় একেবারে মেতে উঠলেন। অল্পদিনের ভিতরেই তিনি থার্মোমিটার বা উত্তাপ-পরিমাপক একটা যন্ত্র আবিষ্কার করে ফেললেন। আজকাল চিকিৎসকেরা অতি সহজে যে শরীরের তাপ পরীক্ষা করতে পারেন—সে তারই দয়ায়।

গ্যালিলিওর আবিষ্কারের মধ্যে সব চেয়ে প্রয়োজনীয়ই হচ্ছে টেলিস্কোপ (Telescope) বা দূরবীন। এই দূরবীন আবিষ্কারের ফলে দৃষ্টি-বিজ্ঞানে সে সময় এক নব-যুগের সূচনা হয়েছিল।

দূরবীন আবিষ্কার করবার মাস কয়েক পূর্ব্বে তিনি শুনতে পান যে, একজন ওলন্দাজ ভদ্রলোক ইটালীর কোন এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে এমনি চমৎকার একটা জিনিষ উপহার দিয়েছেন যার সাহায্যে দু' মাইল দূরের জিনিষও অতি কাছে দেখা যায়। এ কথাটা শুনে তাঁর মনে ভারী কৌতূহল হ'লো। তিনি মনে মনে ভাবলেন যদি কোন রকমে একটা ঐরকম জিনিষ তৈরী

করে নেওয়া যেত—তাহ'লে কি মজাই না হোত! তাহ'লে ঘরে বসেই দূর দূরান্তরের জিনিষ দেখা যেতো। একথা ভেবেই তিনি আর কাল বিলম্ব করলেন না—উঠে পড়ে লেগে গেলেন অমনি একটা জিনিষ তৈরী কর্‌বার জন্য। কিছুকাল গভীর মনোযোগের সঙ্গে চেষ্টা করবার পর তিনি একটা দূরবীক্ষণ যন্ত্র তৈরী করে ফেল্‌লেন। তাঁর যন্ত্রটা খুবই শক্তিশালী হোল—ওলন্দাজ ভদ্রলোকের তৈরী দূরবীক্ষণের চেয়েও অনেক উন্নত ধরণের। তাঁর যন্ত্রের সাহায্যে মাত্র দু' মাইল নয়, বহু দূরের জিনিষ—এমন কি আকাশের গ্রহনক্ষত্রগুলো পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখা যেতো।

এই যন্ত্র আবিষ্কারের কথা যখন দেশের চারদিকে ছড়িয়ে পড়্‌লো—তখন দেশের বহুলোক—ধনী, গরীব, জ্ঞানী, মূর্খ সবাই ছুটে এলো একবার ওর ভিতর দিয়ে দুনিয়াটাকে ভাল করে দেখে নেবার জন্য।

এই আশ্চর্য্য শক্তিশালী দূরবীনের ভিতর দিয়ে দৃষ্টিপাত করে গ্যালিলিও এক অজ্ঞাত জগতের সন্ধান পেলেন। রাত্রি কালে ওর ভিতর দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে, তিনি মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে গেলেন। গ্রহ, উপগ্রহ, চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা প্রভৃতি এক নূতনরূপে এসে তাঁর কাছে আত্মপ্রকাশ করলে। যে চন্দ্রকে এতদিন তিনি একখানা উজ্জ্বল থালার

মত মাত্র দেখে আস্‌ছিলেন, তারই মধ্যে কত পাহাড়পর্ব্বত, সমতলভূমি এবং বিরাট বিরাট গর্ত্ত প্রভৃতির সন্ধান পেলেন। আকাশের তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে তিনি বিস্ময়ে একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। পূর্ব্বে আকাশে যেসব তারা তিনি দেখ্‌তেন এখন তার চেয়ে অনেক বেশী তারা সেখানে দেখ্‌তে পেলেন। কৃত্তিকাপুঞ্জের দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখ্‌লেন সেখানে সাতটী তারাই শুধু নেই—আরও বহু তারা সেখানে রয়েছে। তিনি তার যন্ত্রের মধ্য দিয়ে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করে বহু নূতন গ্রহ উপগ্রহ ও তারকার সন্ধান পেলেন। এ সবের সন্ধান এ পর্য্যন্ত কারও জানা ছিল না। এর ফলে জ্যোতিষ শাস্ত্রে এক যুগান্তর উপস্থিত হলো।

কিন্তু এইসব আশ্চর্য্য আবিষ্কার করায় তাঁর শত্রুর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়ে গেলো। তারা এই আবিষ্কারকে মোটেই সুদৃষ্টিতে দেখ্‌লো না। তারা জনসাধারণের কাছে বলে বেড়াতে লাগ্‌লো—ওসব ভুয়ো। যা কিছু এই যন্ত্রটার ভিতর দিয়ে দেখা যায় তার কিছুর অস্তিত্বই আকাশে নেই—সবই ঐ যন্ত্রটার একটা কারসাজী মাত্র।

এই যন্ত্রের সাহায্যে নানারূপ পরীক্ষা করতে করতে গ্যালিলিও একদা এক মহান্ সত্য আবিষ্কার করে ফেল্‌লেন।

সেদিনে লোকের বিশ্বাস ছিল যে, সূর্য্য পৃথিবীকে প্রতিদিন প্রদক্ষিণ করে, আর তারই ফলে দিনরাত্রি হয়। গ্যালিলিও পরীক্ষা করে প্রমাণ পেলেন—সূর্য্য স্থির হয়েই আছে, পৃথিবীই তাকে প্রদক্ষিণ কর্‌ছে—আর সেই কারণেই দিন ও রাত্রি হচ্ছে। গ্যালিলিও তার পরীক্ষার ফল জনসমাজে প্রচার করে দিলেন। তার এই মত শুনে দেশের ধর্ম্মযাজকের দল একেবারে ক্ষেপে গেলো। কারণ গ্যালিলিও যে মত প্রচার করলেন তা শাস্ত্র-বিরোধী। শাস্ত্রে লেখা আছে "সূর্য্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে।" সুতরাং কেউ যদি এ মত ছাড়া অন্য মত প্রকাশ করে তা হলে তা ধর্ম্ম-বিরোধী নিশ্চয়ই হবে। ধর্ম্ম-যাজকের দল বল্‌লেন,—"গ্যালিলিও এই মত প্রচার করায় মানুষ অবিশ্বাসী হয়ে ধর্ম্ম-শাস্ত্রের উপর তাঁদের যে নিষ্ঠা ও বিশ্বাস রয়েছে তা হারিয়ে ফেল্‌বে। আর ক্রমে ধর্ম্ম রসাতলে যাবে। ধর্ম্ম-যাজকদের এই উক্তি শুনে একটা ভীষণ হুলুস্থুল পড়ে গেলো। সবাই গ্যালিলিওর উপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠ্‌লো। সে সময় ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম-যাজকদের প্রতি লোকের অবিচলিত নিষ্ঠা ও ভক্তি ছিলো। এজন্য ধর্ম্ম-যাজকদের প্রাধান্য এবং প্রতিপত্তি ছিলো খুবই বেশী। তখন প্রচলিত ধর্ম্ম-বিশ্বাসে যদি কেউ কোন রকম আঘাত

কর্‌তো তবে ধর্ম্ম-যাজকেরা তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন।

শাস্ত্র-বিরোধী মত প্রচারের জন্য ধর্ম্ম-যাজকের দল তাঁকে অভিযুক্ত করলেন। প্রধান ধর্ম্মগুরু পোপের দরবারে তাঁর বিচার আরম্ভ হোলো। তাকে প্রশ্ন করা হোলো—"আপনি যে প্রচার করে বেড়াচ্ছেন—পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে—এ সম্বন্ধে আপনার কি বল্‌বার আছে—আমরা শুন্‌তে চাই।"

গ্যালিলিও নির্ভীক ভাবে উত্তর করলেন—"আমি যা প্রচার করেছি তা অতি সত্য। কারণ আমি পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণ পেয়েছি বলেই এরূপ মত প্রচার করেছি। আমি নিজেও একথা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে থাকি।"

পুনরায় প্রশ্ন হোলো—"জানেন, আপনি এ মত প্রচার করে ধর্ম্মদ্রোহিতার কাজ করেছেন।"

গ্যালিলিও বল্‌লেন—"আমি ধর্ম্মদ্রোহিতার কোন কাজই করি নাই—আমি বিজ্ঞানের সেবক—আমি সত্যের পূজারী—সুতরাং আমি সত্য বলে যা বুঝেছি তা-ই প্রচার করেছি।"

বিচারপতি বল্‌লেন—"ধর্ম্ম-শাস্ত্রে যা লেখা আছে, পৃথিবীতে তার চেয়ে বড় সত্য আর কিছুই নাই; সুতরাং

আপনি যদি আপনার মত পরিবর্ত্তন না করেন—তা হলে আপনাকে যন্ত্রে নিষ্পেষিত করে হত্যা করা হবে।”

সত্তর বৎসর বয়স্ক জরাগ্রস্ত বৈজ্ঞানিক বিচারকের উক্তি শুনে শিউরে উঠ্‌লেন।

তিনি কতকটা যেন আপন মনেই বলে ফেল্‌লেন—“তা হলে আপনারা যা বল্‌ছেন তা-ই সত্যি—সূর্য্যই পৃথিবীর চারদিকে ঘূর্‌ছে। আর আমার বিশ্বাসই ভুল।”

তাঁর কথা শুনে বিচারক তাঁকে মুক্তি দিলেন। মুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সত্যের সাধক বুঝ্‌লেন—তিনি যে কথা বলেছেন তা ত তাঁর হৃদয়ের কথা নয়। এ-ত তিনি প্রাণভয়ে বলে ফেলেছেন। পৃথিবীতে সত্যের উপরে কিছুই নাই—প্রাণ ত সবার মত তাঁরও একদিন যাবে—সুতরাং সে জন্য সত্যকে পরিত্যাগ করা ভীরুতা ছাড়া আর কি!

তিনি এই কথা ভেবেই আবার বলে উঠ্‌লেন—“পৃথিবীই ঘোরে, সূর্য্য নয়।”

বিচারক তাঁর এই মন্তব্য শুনে তাঁকে বন্দী করতে আদেশ দিলেন। সবাই বল্‌লে, এর শাস্তি হয় প্রাণদণ্ড নয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

বৃদ্ধ বলে দয়া করে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডই দেওয়া হোল। এই মনীষার বরপুত্রের শেষ জীবনটা বড়ই করুণ—

বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। নিঃসঙ্গ অবস্থায় রাজ-কারাগারে বাস করে তিনি প্রায় পাগলের মত হয়ে উঠ্‌লেন। ক্রমে তাঁর ছু'টি চোখ—একদা যার সাহায্যে তিনি বিশ্বের বুকে কত সব নূতন গ্রহ, উপগ্রহ, তারকা প্রভৃতির সন্ধান পেয়ে, জ্যোতিষ শাস্ত্রে এক বিপ্লব উপস্থিত করেছিলেন, সেই ছু'টী চোখই দৃষ্টি হীন হয়ে পড়্‌লো। শেষ বয়সে তিনি চোখে আর একেবারেই দেখতে পেতেন না।

এই ভাবে শুধু ধর্ম্ম-যাজকদের গোঁড়ামীর জন্য সুদীর্ঘ কাল নির্জ্জন কারাকক্ষে আবদ্ধ থেকে বিজ্ঞানের এই আদিগুরুর এরূপ দুর্দ্দশা হোলো। তাঁর চোখ ছু'টী দৃষ্টিহীন হয়ে পড়ায় তিনি অত্যন্ত নিরাশ হয়ে পড়লেন। অন্ধ না হ'লে হয়ত তিনি আরও অনেক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করে বিজ্ঞানকে খুবই সমৃদ্ধ করে যেতে পারতেন।

এই সময় জানিনা কেন হঠাৎ ধর্ম্মগুরু পোপের সুমতি হোলো। তিনি গ্যালিলিওকে কারামুক্ত করে দিলেন। কারাগার থেকে বেরিয়ে তিনি ফ্লোরেন্স নগরীর উপকণ্ঠে পাহাড়ের ওপরে তাঁর একখানা ছোট কুটীর ছিল, সেখানে বাস কর্‌তে লাগ্‌লেন। এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা ছিল তাঁর কন্যা ছু'টী। তাঁরা খৃষ্ট-পন্থী সন্ন্যাসিনী ছিলেন। এরা ফ্লোরেন্সের নিকটবর্ত্তী এক খৃষ্টীয় মঠের

অধিবাসিনী ছিলেন। সব সময়ে তাঁরা তাঁদের বৃদ্ধ পিতার কাছে থাক্‌তে পেতেন না। মাঝে মাঝে এসে তাঁকে দেখাশোনা করে যেতেন। এতেই এই বৃদ্ধ জ্ঞানী অনেকটা শান্তিলাভ করতেন।

এই সময়ে ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ কবি মিল্টন ইটালীতে বেড়াতে এসেছিলেন। তিনি ইংলণ্ড থেকে আসার সময় সেখান থেকেই ইটালীর কয়েকজন বিখ্যাত লোকের নিকট পরিচয়-পত্র নিয়ে এসেছিলেন। এর মধ্যে একখানা ছিল গ্যালিলিওর কাছে। মিল্টনের বয়স এই সময়ে অল্প ছিল। তিনি গ্যালিলিওর বাড়ী গিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন কর্‌লেন। তারপর বহুক্ষণ এই অন্ধ জ্ঞানীর সঙ্গে নানাবিষয়ে আলাপ করলেন এবং পরিশেষে তাঁর চোখ দু'টী দৃষ্টিহীন হওয়ার জন্য সহানুভূতি জ্ঞাপন করলেন। কিন্তু অদৃষ্টের কী নির্ম্মম পরিহাস—বৃদ্ধ বয়সে মিল্টনও অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

ফ্লোরেন্সের এই গৃহেই গ্যালিলিওর মৃত্যু হয়।

বহুকাল অতীত হওয়ার পরে এ যুগে তাঁর স্বদেশবাসীরা তাঁদের পূর্ব্বপুরুষের মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে সুরু করেছে। নানাভাবে এই জ্ঞান-বীরের স্মৃতি-তর্পণের ব্যবস্থা করে, তারা জগতের লোকের ধন্যবাদ-ভাজন হচ্ছেন।

নিউটন

আকাশ লক্ষ্য করে যদি একটা ঢিল ছোঁড়া যায় তা'হলে কতকদূর উঠেই ঢিলটা নীচে মাটীতে পড়ে যায়। কেন এমন হয়, একথা তোমরা কেউ-ই হয়ত জানোনা। একদা এক অতি সাধারণ ঘটনাকে উপলক্ষ্য করেই এই জটিল প্রশ্নের সমাধান হয়েছিল।

প্রায় তিন শ' বছর আগের কথা। মহাজ্ঞানী বৈজ্ঞানিক নিউটন একদিন তাঁর বাগানে বসে বসে বিজ্ঞানের নানা সমস্যার কথা মনে মনে আলোচনা কর্‌ছিলেন, এমনি সময় হঠাৎ টুপ করে গাছ থেকে পাকা একটা আপেল তাঁর সাম্‌নে এসে পড়্‌লো। এই অতি সাধারণ ব্যাপারটাই তাঁকে খুব বেশী করে ভাবিয়ে তুল্‌লে। এরকম হওয়া স্বাভাবিক। আমরা যাকে সাধারণ মনে করি—যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা তার মধ্যেই অনেক কিছু নূতন তথ্যের সন্ধান পান। তিনি মনে মনে ভাব্‌লেন—"কেন এমন হয়? আপেলটা ত মাটীতে না পড়ে ওপরের দিকেও যেতে পার্‌তো। তবে তা না গিয়ে মাটীতে এসে পড়্‌লো কেন?" তিনি এই নিয়ে পরীক্ষা স্নুরু করলেন পরীক্ষা করে করে স্থির করলেন যে, পৃথিবীর মধ্যে একটা স্বাভাবিক আকর্ষণী শক্তি আছে—আর সেই শক্তিবলেই পৃথিবী সব জিনিষকে আকর্ষণ করে টেনে একেবারে নিজের

কাছে নিয়ে আসে। এই আকর্ষণী শক্তির তিনি নামকরণ করলেন "মাধ্যাকর্ষণ"।

এ পর্য্যন্ত প্রমাণ পেয়েই যে তিনি ক্ষান্ত হলেন—তা নয়। এ নিয়ে তিনি আরও পরীক্ষা কর্‌তে লাগলেন। বহু পরীক্ষার পর তিনি এক আশ্চর্য্য সিদ্ধান্তে এসে উপস্থিত হলেন। আমরা সাধারণভাবে দেখ্‌তে পাই আপেলটাই গাছ থেকে পৃথিবীর দিকে নেমে আসে কিন্তু পরীক্ষা করে তিনি প্রমাণ পেলেন যে, আপেল যেমন পৃথিবীর দিকে নেমে আসে; পৃথিবীও তেমনি আপেলের দিকে উঠে যায়। একথা শুনে তোমরা হয়ত মনে মনে ভাব্‌ছো—তা'হলে ভারী মজার ব্যাপার ত! কৈ আমরা ত সে রকম কিছুই দেখ্‌তে পাই না। এখানেই ত আমাদের মত সাধারণ লোক ও বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে তফাৎ। তারা পরীক্ষা করে করে কত কিছু নূতন নূতন ব্যাপার জান্‌তে পারেন।

যাক্ সে কথা—এখন কথা হচ্ছে এর কারণটা কি? নিউটন বল্‌লেন—"এর কারণ ত আর কিছুই নয়। কারণ হচ্ছে উভয়ের মধ্যেই উভয়কে আকর্ষণ করবার একটা শক্তি আছে—আর তারই ফলে এরূপ হওয়া সম্ভব হচ্ছে। শুধু তাই-ই নয়—এতবড় প্রকাণ্ড পৃথিবী ক্ষুদ্র আপেলকে

যে শক্তিতে আকর্ষণ করে টেনে আন্‌ছে, আপেলও পৃথিবীকে সেই একই শক্তিতে আকর্ষণ কর্‌ছে। তা হ'লে এখন এখানে তোমরা আর একটা প্রশ্ন করতে পার—উভয়ের মধ্যে যখন উভয়কে আকর্ষণ করবার সমান শক্তিই রয়েছে—তখন পৃথিবীটাও ত ছুটে আপেলের কাছে যেতে পারতো—তা না গিয়ে আপেলটাই ছুটে পৃথিবীর কাছে যায় কেন? এর উত্তর হচ্ছে—পৃথিবী খুব প্রকাণ্ড জিনিষ বলে আপেল সমান শক্তিতে আকর্ষণ করেও তাকে নিজের কাছে আনতে পারে না। আপেলটা পৃথিবীর তুলনায় অতি ক্ষুদ্র তাই পৃথিবী একই পরিমাণ শক্তিতে টেনে তাকে নিজের কাছে নিয়ে আসে।

পরস্পরের মধ্যে পরস্পরকে আকর্ষণ করবার এই যে শক্তি রয়েছে, তার ফলে পৃথিবীতে সর্ব্বদাই এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘট্‌ছে। ঊর্দ্ধে আকাশের দিকে লক্ষ্য করে তোমরা দেখ, সেখানে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র কত কিছু রয়েছে। আকাশে ওদের দেখে তোমরা একথাও সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয়ই ভাবছো—আকাশটা ত ফাঁকা, তবে কাকে অবলম্বন করে ওরা ওখানে ঝুল্‌ছে! ব্যাপারটা তোমাদের কাছে নিশ্চয় একটা ধাঁধাঁর মত মনে হচ্ছে। তোমরা হয়ত শত চেষ্টা করেও এ ধাঁধাঁর উত্তর বার করতে পার্‌ছো না। এর উত্তর কিন্তু খুবই সোজা—অবশ্য যারা জানে তাদের কাছে। প্রত্যেক

জিনিষেরই মধ্যে যে আকর্ষণী শক্তি রয়েছে তারই ফলে এই আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্ভব হচ্ছে।

গ্যালিলিও আবিষ্কার করেছিলেন যে, পৃথিবী সূর্য্যের চারদিকে ঘোরে। কিন্তু কেন ঘোরে সেকথা তিনি সঠিক ভাবে বল্‌তে পারেন নি। নিউটনই তার কারণ সর্ব্বপ্রথম প্রমাণ করে দিয়ে বিজ্ঞান-জগতে এক নূতন তথ্য প্রকাশ করেন। নিউটন বল্‌লেন—"অন্যান্য সকল জিনিষের মত গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতির মধ্যেও আকর্ষণী শক্তি রয়েছে। এই আকর্ষণী শক্তির ফলেই এরূপ অদ্ভুত কাণ্ড সম্ভব হচ্ছে।" তিনি এর নাম দিলেন "মহাকর্ষণ"। কথাটা বোধ হয় তোমরা খুব ভাল করে বুঝ্‌তে পারলে না। আচ্ছা, ব্যাপারটা একটু খুলেই বল্‌ছি।

"চুম্বক" নামে একরকম ধাতব পদার্থ তোমরা নিশ্চয় দেখেছ। একখণ্ড লোহাকে যদি একখণ্ড চুম্বকের কাছে রাখা যায়, তা'হলে লোহার টুকরাটা ছুটে গিয়ে ঐ চুম্বকের গায়ে একেবারে সংলগ্ন হয়ে পড়ে। আবার লোহার টুকরাটাকে যদি চুম্বক থেকে বেশ্ একটু তফাতে রাখ, তবে দেখবে যে আর লোহাটা ছুটে গিয়ে চুম্বকের গায়ে লাগছে না, স্থির হয়ে যেখানে ছিল সেখানেই আছে। লোহার টুকরাটাকে আরও কতকটা এগিয়ে নিয়ে রাখ্‌লেও হয়ত

সেটা ছুটে গিয়ে চুম্বকের গায়ে লাগে না কিন্তু তা হ'লেও সেটা যেখানে রাখা হয়েছে সে জায়গাটা চুম্বকের আকর্ষণের বাইরে নয়। তার প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে চুম্বকটাকে একটু নাড়ালে পর। চুম্বকটা নাড়ালেই দেখা যাবে যে লোহার টুকরাটাও নড়্ছে। শুধু তাই নয় সমান ব্যাসের মধ্যে রেখে চুম্বকটাকে ঘোরাও দেখ্বে লোহার টুক্রাটাও সঙ্গে সঙ্গে ঘুর্ছে। আবার ঐ লোহার টুক্রাটা যদি চুম্বকের চেয়ে অনেক বেশীগুণ ভারী হয় তা হলে অতি কাছে থেকেও চুম্বক তাকে আকর্ষণ করতে পারে না।

মহাকর্ষণের ব্যাপারটীও হুবহু ঐ রকমই। ধরে নাও, পৃথিবীটা যেন চুম্বক আর ওর মধ্যে চুম্বকেরই মত একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ করবার শক্তি রয়েছে। আর ধর, মানুষের কথা। মানুষের মধ্যেও আকর্ষণী শক্তি আছে। কিন্তু পৃথিবীর তুলনায় মানুষ কতটুকু! এই কারণেই মানুষকে পৃথিবী আকর্ষণ করে রাখে কিন্তু মানুষ পৃথিবীকে আকর্ষণ করতে পারে না। বহু চেষ্টা করেও মানুষ ওপরের দিকে উঠ্তে পারে না। লাফিয়ে ওপরে উঠ্তে গেলেও উঠ্তে পারে না, মাটীতে পড়ে যায়। কারণ মানুষ পৃথিবীর এত কাছে রয়েছে যে কিছুতেই তারা পৃথিবীর আকর্ষণের বাইরে যেতে পারে না।

শুক্র গ্রহের কথা এখন ধরা যাক্। ঐ গ্রহটীও পৃথিবীর চেয়ে অনেক ছোট। কিন্তু তবু পৃথিবী তাকে তার আকর্ষণী শক্তির সাহায্যে নিজের কাছে টেনে আন্‌তে পারে না। তার কারণ কি? কারণ হচ্ছে, পৃথিবী শুক্র গ্রহ থেকে এতদূরে আছে যে সে যায়গা পর্য্যন্ত পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি পৌঁছুতেই পারে না।

আবার চাঁদের ব্যাপারখানা দেখ কী রকম। সেও এমন একটা যায়গায় রয়েছে যেখান থেকে তাকে টেনে আনা পৃথিবীর পক্ষে মাত্রই সম্ভব হচ্ছে না। অথচ সে ক্রমাগতই পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। তার কারণ আর কিছুই নয়। যে জায়গায় চাঁদটা আছে সে জায়গাটা পৃথিবীর আকর্ষণের বাইরে নয়। তাই পৃথিবী যেম্‌নি সূর্য্যের আকর্ষণী শক্তি বলে তার চারদিকে ঘূরছে, চাঁদও সঙ্গে সঙ্গে, লোহার টুকরা যেমন চুম্বকের আকর্ষণে ঘোরে, তেমনি ভাবে পৃথিবীর চারদিকে ঘূরে যাচ্ছে। সমস্ত গ্রহ উপগ্রহগুলিই এই একই নিয়মে চল্‌ছে। আর এই মহাকর্ষণের জন্যই মহাশূন্যে অবস্থান করেও ওরা কক্ষচ্যুত হয়ে ছুটে পড়ে যাচ্ছে না; একে অপরকে আকর্ষণ করে রাখছে। এই তথ্য আবিষ্কার করে নিউটন বিজ্ঞান-জগতে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। মহাকর্ষণের

আবিষ্কর্ত্তা হিসেবে আজও সবাই তাঁর পূজো করে থাকে।

১৬৪২ খৃষ্টাব্দের পঁচিশে ডিসেম্বর, ইংলণ্ডের লিঙ্কনশায়ারের অন্তর্গত উলস্‌থর্প নামে এক ক্ষুদ্র গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। এই বৎসরই বিজ্ঞানাচার্য্য গ্যালিলিওর মৃত্যু হয়েছিল। সুতরাং এ বৎসরটা বিজ্ঞান-জগতে দুইদিক থেকেই স্মরণীয় হয়ে আছে।

খুব বড়লোকের ঘরে নিউটনের জন্ম হয় নি। তাঁর পিতা ছিলেন সাধারণ মধ্যবিত্ত কৃষক। নিউটনের জন্ম হওয়ার তিন চার মাস পূর্ব্বেই তাঁর পিতার মৃত্যু হয়েছিল। জন্মের পর তাঁর কৃশ ও দুর্ব্বল আকৃতি দেখে সবাই ভেবেছিল যে, এ ছেলে বেশী দিন বাঁচবে না। ছেলের যাতে খুব ভালো যত্ন হয় এজন্য মা দু'জন ধাত্রী রেখে নিলেন। এদের অক্লান্ত সেবা শুশ্রূষার ফলেই বালক ক্রমে সুস্থ ও সবল হয়ে উঠ্‌লো।

বাল্যকালে নিউটনকে দেখে কেউই মনে করতে পারে নি যে, কালে তিনি এরূপ অদ্ভুত মনীষা ও প্রতিভার পরিচয় দিয়ে একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ও গণিতজ্ঞ বলে পরিচিত হতে পারবেন।

কোন বিশেষ কারণে নিউটনের প্রতিপালনের ভার পড়েছিল তার দিদিমার ওপর। তিনি তাঁর যত্নও নিতেন

যেমনি, তেমনি তাঁকে ভালও বাস্‌তেন খুব বেশী। একটু বয়স হলে তাঁকে পাঠশালায় ভর্ত্তি করে দেওয়া হোল। পাঠশালার ছাত্র হিসেবেও তিনি খুব বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন নি। কিন্তু তিনি ঐ বয়সেই কারিগরী কাজে এমন সব আশ্চর্য্য উদ্ভাবনী-শক্তির পরিচয় দিতে লাগ্‌লেন যা তার বয়সের ছেলের পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয়। তিনি সর্ব্বদাই শুধু হাতুড়ী, বাটালী, করাত ইত্যাদি যন্ত্রপাঁতি নিয়েই থাক্‌তেন। পাঠশালার ছুটীর পর অন্যান্য ছেলেরা যখন খেলাধূলো গল্পগুজব নিয়ে মত্ত, তখন নিউটন বসে বসে নিবিষ্ট চিত্তে যন্ত্রপাঁতি দিয়ে নানারকম চমৎকার সব জিনিষ তৈরী করতেন। জিনিষগুলো হতোও আবার এমনি চমৎকার যে সবাই একবাক্যে সেগুলোর প্রশংসা করতো। এসব দেখে তার দিদিমা ভাব্‌তেন—কালে তাঁর নাতি একজন ভারী নামজাদা মিস্ত্রী হবে আর এইসব জিনিষ তৈরী করে যথেষ্ট টাকা পয়সাও উপার্জ্জন করবে। কেউ তখন অনুমান পর্য্যন্ত করতে পারে নি যে, এই সব সাধারণ উদ্ভাবনী-শক্তির আড়ালে ভবিষ্যৎ বৈজ্ঞানিকের প্রতিভার বীজ লুকিয়ে লুকিয়ে অঙ্কুরিত হচ্ছে।

দিদিমা'র আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবেরা নিউটনের এইরকম উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পেয়ে তাকে বললেন

—কোন ঘড়ী-প্রস্তুতকারীর কাছে নিউটনকে শিক্ষানবীশ হিসেবে কাজ শেখার জন্য পাঠাতে। এর একটু কারণও ছিল—এরই মধ্যে নিউটন চমৎকার রকমের একটা জলঘড়ী তৈরী করে ফেলেছিলেন। ঘড়ীটাকে কোন কলকব্জার সাহায্যে চালাতে হোতো না। এ চল্‌তো শুধু জলের সাহায্যে। এজন্যই এর নাম দেওয়া হয়েছিল জল-ঘড়ী। ঘড়ীটী সময়ও দিতো খুব ঠিক।

বাল্যকাল থেকেই নিউটনের এক একটা অতি কঠিন বিষয়েরও সহজ সমাধান করার শক্তি ছিল। এবং ভবিষ্যতে তাঁর এই শক্তি আরও বেড়ে গিয়েছিল। কোন্ বাতাসের গতি-বেগ কেমন—তার ভারী ইচ্ছা হোল এ রহস্যের তিনি একটা সমাধান করেন। শুধুমাত্র বাতাসের গতির বিপরীত দিকে লাফিয়ে, তিনি এ রহস্যের একটা সন্তোষজনক মীমাংসা করে ফেল্‌লেন। শুধু মাত্র ঐভাবে লাফ দিয়েই তিনি ঠিক করতে পারতেন—কখন মৃদু সমীরণ, কখন সাধারণ বাতাস আর কখন ঝড় বইছে। বাল্যকাল থেকেই নিউটন শুধুমাত্র এইরকম খেলাধূলোর ছলে প্রকৃতির নানা রহস্যের সমাধান করে যাচ্ছিলেন।

পাঠশালার পড়া শেষ হবার আগেই নিউটনের মা তাকে দিদিমার বাড়ী থেকে নিয়ে এলেন। তিনি বল্‌লেন—

এখন তার কৃষির কাজ শিখ্‌তে হবে। এ বয়সে এ কাজ শিখে না নিলে বড় হয়ে সে পৈতৃক ক্ষেত খামার রক্ষা করবে কি করে? নিউটনের কিন্তু মায়ের উপদেশটা খুব ভালো লাগ্‌লো না। ভবিষ্যতে যিনি একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হবেন, তাঁর কাছে এ কাজ ভাল না লাগারই ত কথা। মা একজন বুড়ো চাকরকে সঙ্গে দিয়ে তাঁকে ক্ষেতের ফলমূল শাকসব্জী বেচ্‌বার জন্য হাটে পাঠিয়ে দিতেন। নিউটন করতেন নাকি চাকরকে হাটে জিনিষ বেচতে পাঠিয়ে, নিজে পথের মধ্যে গাছতলায় বসে বসে গণিত শাস্ত্রের বই পড়্‌তেন। মা পাঠাতেন তাকে ক্ষেতে মজুরদের কাজ দেখ্‌তে—তিনি কাজ দেখ্‌বেন কি ক্ষেতের পাশে বই নিয়ে বসে বসে তাই পড়্‌তেন। দিন নেই রাত্রি নেই শুধু পড়া আর পড়া। ছেলের এরকম দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় পেয়ে ক্রমে মা-ও তাঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ শঙ্কিত হয়ে উঠ্‌লেন। তিনি মনে মনে ভাব্‌লেন—ভবিষ্যতে এ ছেলে খাবে কি করে?

গণিত-শাস্ত্রের প্রতি নিউটনের এরূপ অদ্ভুত নিষ্ঠা লক্ষ্য করে, সকলেই তাঁর মাকে বল্‌লে—“এ ছেলেকে দিয়ে ক্ষেতের কাজকর্ম্ম কিছু চল্‌বে না। একে কোথাও আবার পড়তে পাঠিয়ে দাও।” সে সময় ইংলণ্ডে গণিত-শাস্ত্র চর্চ্চার প্রধান কেন্দ্র

ছিল কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়। আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের পরামর্শে সেখানে গিয়েই তিনি ভর্ত্তি হলেন।

এখানে ভর্ত্তি হয়েই তাঁর প্রতিভা সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হোলো। তিনি এখানে আলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করলেন। কতককাল গবেষণা করবার পর তিনি আশ্চর্য্য এক সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছলেন। তিনি বল্‌লেন—সূর্য্যের আলোক এমনি সাদা বলে মনে হলেও—ওর মধ্যে সাতটী বিভিন্ন বর্ণের রশ্মির সমাবেশ আছে। তিনি তাঁর এই সিদ্ধান্ত প্রমাণও করে দিলেন। আলোকের এই রহস্য এমনি বোঝা না গেলেও—তে-শিরা কাঁচের (Prism) সাহায্যে সূর্য্যের রশ্মি বিশ্লেষণ করলে ব্যাপারটা অতি সহজেই বোঝা যেতে পারে। এ ব্যাপারটা তোমরাও পরীক্ষা করে দেখ্‌তে পার। ঝাড় লণ্ঠনের সঙ্গে যে তিন কোণাওয়ালা কাচের কলম থাকে তারই একটা কলম সূর্য্যের আলোর মধ্যে ধরে দেখো, দেখ্‌বে কেমন সুন্দর সাতটী বর্ণ সূর্য্যের আলোকের মধ্যে দেখা যাচ্ছে।

সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস সম্বন্ধে নিউটন যে নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন—তা-ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে এক অভিনব বস্তু। এ ছাড়া নিউটন গণিত ও জ্যামিতির বহু নূতন সিদ্ধান্ত আবিষ্কার করে গণিত ও জ্যামিতিকে বিশেষরূপে

সমৃদ্ধ করলেন। এই সব সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর খ্যাতিতে দেশ ভরে উঠলো।

এই সময়ে কেম্ব্রিজ সহরে দুরন্ত প্লেগরোগ মহামারীরূপে আত্মপ্রকাশ করে। অন্যান্য সকলের মত নিউটনও এই কারণে কেম্ব্রিজ পরিত্যাগ করে গৃহে ফিরে আসেন। বাড়ী এসে তাঁর খুবই অসুবিধা হতে লাগ্‌লো। এখানে পড়্‌বার জন্য না পেতেন বই, না পেতেন কোন অধ্যাপকের সাহায্য। তবুও তিনি আপন ভাবে বিজ্ঞানের চর্চ্চা করতেন। এই সময়েই তিনি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ মহাকর্ষণের সিদ্ধান্ত আবিষ্কার করেন। সে সম্বন্ধে পূর্ব্বেই তোমাদের বলেছি।

যা হোক মহামারীর প্রকোপ বন্ধ হয়ে গেলে, তিনি আবার কেম্ব্রিজে ফিরে গেলেন। তাঁর এই সমস্ত অভিনব আবিষ্কারের বিষয় বিবেচনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁকে গবেষণা কার্য্যে উৎসাহ দেওয়ার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করলেন। প্রায় দুই বৎসর কাল গবেষণা করে তিনি আরও অনেক নূতন তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত আবিষ্কার করেন।

এই সময়ে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক পদত্যাগ করেন। এই পদে নিউটনকে নিযুক্ত করা হোল। তিনি যে শুধু আবিষ্কর্ত্তা হিসেবেই খ্যাতি লাভ করেছিলেন

তা নয়, তাঁর অধ্যাপনার রীতিও ছাত্রদের বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করেছিল।

১৬৭১ খৃষ্টাব্দে নিউটনকে বিজ্ঞানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমিতি রয়েল সোসাইটীর সভ্য মনোনীত করা হয়। নিয়ম আছে যে প্রতি সপ্তাহে প্রত্যেক সভ্যকে এক শিলিং করে চাঁদা দিতে হবে। তখন নিউটনের আয় অতি অল্প ছিল—সুতরাং প্রতি সপ্তাহে তিনি ঐ চাঁদা দিয়ে উঠ্‌তে পারতেন না। যা আয় হোতো তা পরিবারবর্গের ভরণপোষণেই ব্যয় হয়ে যেত। এইজন্য সমিতির সভ্যেরা স্থির করলেন যে, নিউটনকে কোন চাঁদা দিতে হবে না। তাঁরা বল্‌লেন,—চাঁদা দিতে না পারার জন্য নিউটনের মত জ্ঞানীর নাম সভ্য-তালিকা থেকে উঠিয়ে দেওয়া যায় না।

আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকার দরুণ নিউটন যে খুব ক্ষুণ্ণ ছিলেন তা নয়। কারণ তিনি ছিলেন সত্যিকার জ্ঞানী। জ্ঞানের চর্চ্চাতেই তিনি আনন্দ পেতেন—অর্থলিপ্সা তাঁর মাত্রই ছিল না।

নিউটনের বন্ধুরা তাঁর আর্থিক অস্বচ্ছলতার কথা সর্ব্বদাই ভাব্‌তেন। তাঁরা ভাবতেন যে, নিউটনের আয় বৃদ্ধি না পেলে তিনি নির্ব্বিঘ্ন চিত্তে বিজ্ঞানের সেবায় মনোনিবেশ করতে পারবেন না। এই কারণেই তারা তাঁর

আর্থিক অনটন দূর করবার জন্য সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত ছিলেন। টাঁকশালের অধ্যক্ষের পদ শূন্য হওয়ায় এই সময়ে এক সুযোগ মিলে গেলো। এই পদে তাঁকে নিযুক্ত করবার জন্য সকলেই ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লেন এবং সকলের সাহায্যে তিনি ঐ পদ পেলেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি ঐ পদেই নিযুক্ত ছিলেন। টাকশালের অধ্যক্ষরূপে তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন এবং একাজে তিনি যে খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন, আজ পর্য্যন্ত টাকশালের অপর কোন অধ্যক্ষের পক্ষে সেরূপ খ্যাতি অর্জ্জন করা সম্ভব হয় নি। ১৭২৭ সালের ২০শে মার্চ্চ প্রায় চৌরাশী বৎসর বয়সে নিউটনের মৃত্যু হয়।

তিনি পরম পণ্ডিত হয়েও বিনয়ের অবতার ছিলেন। এরূপ বিনয়ী ব্যক্তি সে সময়ে খুবই অল্প দেখা যেতো। একদা তিনি বিনয় প্রকাশ করে বলেছিলেন—“সম্মুখে জ্ঞানের সীমাহীন সমুদ্র—তারই তীরে দাঁড়িয়ে আমি—নিতান্তই বালকের মত—শুধু পাথরের নুড়ি কুড়িয়ে যাচ্ছি।” এরূপ কথা তাঁর মত পরম জ্ঞানীর মুখেই শুধু শোভা পায়।

আকাশের আলো

সে অনেক অনেক দিন আগের কথা—তখন কোন এক দেশে বাস কর্‌তো একটী মেয়ে। নাম তার চপলা। শ্বেতপদ্মের কুঁড়ির মতই শুভ্র সুন্দর সে।

দেশের পাশ দিয়ে বয়ে যায় ছোট্ট একটী নদী—কুলু কুলু রবে—তির্‌ তির্‌ করে। তার-ই তীরে আপন মনে খেলে বেড়ায় চপলা। নদীর তীরেই বন। বন থেকে সে ফুল কুঁড়িয়ে এনে গাঁথে মালা। আপন মনে ঐ গাঁথা মালা গলায় পরে, আবার কি ভেবে খুলে ফেলে দেয়। এম্‌নি ভাবেই আনন্দে চপলার দিনগুলো যায় কেটে। একদিন সেই পথে দেবরাজ ফুলরথে চড়ে কোথায় যান্‌। সহসা তাঁর দৃষ্টি পড়্‌লো ঐ চপলারই দিকে। দেবরাজ হলেও অমন সুন্দর মেয়ে তাঁর চোখে তখনও পড়েনি।

তিনি রথ থামিয়ে নেমে এলেন তার কাছে। বল্‌লেন—"আমায় বিয়ে করবে? আমি তোমায় স্বর্গের রাণী কর্‌বো।"

চপলা কোন বন্ধনেই ধরা দিতে রাজী নয়—সে আপন মনে নদীর তীরে তীরে বসন্তের হাল্‌কা বাতাসের মত খেলা করে, বনে বনে ফুল কুঁড়িয়ে, আর সেই ফুলে মালা গেঁথেই জীবন কাটিয়ে দিতে চায়। সুতরাং সে দেবরাজের কথায় রাজী

হোল না। দেবরাজ কিন্তু তার কথা শুন্‌লেন না। তাকে জোড় করে রথে তুলে নিয়ে স্বর্গে চলে এলেন।

স্বর্গে এসে চপলার মনে আর সুখ নেই, নাওয়া খাওয়া নেই—শুধু বসে বসে কাঁদে আর কাঁদে। দেবরাজের পায়ে ধরে সে কত কাঁদ্‌লো, কত মিনতি করলো—তাকে তার দেশে ফিরিয়ে পাঠাতে। কিন্তু তিনি কোন কথাই শুন্‌লেন না—একেবারে অচল অটল হয়ে রইলেন।

চপলার না খেয়ে খেয়ে দিন দিন শরীর শুকিয়ে যেতে লাগ্‌লো। তার পূর্ব্বের সে শ্রী ঘুচে গেলো। তবু দেবরাজের দয়া হলো না।

কিন্তু চপলার দুঃখ দেখে আকাশের মেঘেদের হলো ভারী দয়া। দেবরাজ আর যাতে কখনও তার দেখা না পান—কারণ দেখ্‌তে পেলেই আবার তাকে বন্দী করবেন, এজন্য তারা করলে না কি তাকে তাদের পেছনে এনে লুকিয়ে রাখ্‌লে। দেবরাজ আর তার দেখা পেলেন না।

সেই থেকে চপলা মেঘের আড়ালে আড়ালেই ঘুরে বেড়ায়—আর দেবরাজকে দেখ্‌লেই খিল্ খিল্ করে ওঠে হেসে। দেবরাজ তাকে ধরতে না পেরে আক্রোশে গর্জ্জন করে ওঠেন। সেই থেকে চিরদিন এমনি ধারাই চলেছে। মেঘলা আকাশের বুকে তোমরা যে আঁকাবাঁকা আলোক-রেখা

দেখ্‌তে পাও তা-ই চপলার হাসি, আর দেবরাজ যখন গর্জ্জন করেন তখন তোমরা তাকে বজ্রের হুঙ্কার বলে মনে কর।

গল্পটা শুনে অবধি তোমরা হয়ত আমার ওপর মনে মনে ভারী চটে গেছ। হয়তো বল্‌ছো—ওসব বাজে কথা রেখে দিন। আজকাল আর আপনার এসব গালগল্পে কেউ বিশ্বাস করবে না। মেঘলা আকাশের বুকে যে আলোক রেখা দেখা যায়—সে হচ্ছে বিদ্যুৎ। ওখানে আবার কোন মানুষ আছে নাকি যে খিল্‌ খিল্‌ করে হাস্‌বে। আর যদিই বা কেউ ওখানে থেকে হাসেও তবে তা থেকে আলোকেরই বা সৃষ্টি হবে কেন?

আজ হয়ত অতি সহজেই তোমরা বলে ফেল্‌লে ও জিনিষটা বিদ্যুৎ। কিন্তু এমন এক সময় ছিল যখন লোকে এ রকম গল্প বিশ্বাস করতো। শুধু কি এ ধরণের এই একটী গল্পই প্রচলিত ছিল? না তা নয়। কেউ মেঘলা আকাশের এই 'হঠাৎ আলোর ঝলকানী'কে বল্‌তো—ক্রুদ্ধ হয়ে স্বর্গ থেকে দেবতারা আমাদের শাসন কর্‌ছেন। আবার কেউ কেউ বল্‌তো স্বর্গে দেবতা ও অসুরে যুদ্ধ হচ্ছে, আর দেবরাজ ইন্দ্র বজ্র ছুঁড়ে অসুরদের হত্যা কর্‌ছেন। এই রকম আরও কত কি! কিন্তু কালক্রমে একদিন মানুষ তার ভুল বুঝ্‌তে পার্‌লো, তখন তার মনে প্রকৃতির

এই রহস্যের একটা সত্যিকার সমাধান করবার ইচ্ছা হলো।

এইখানে গোড়ার কথা একটু বলে নিলে গল্পটা তোমাদের বোঝবার পক্ষে সুবিধে হবে। বিদ্যুৎ বলে যে একটা জিনিষ আছে, একথা অনেক দিন থেকেই লোকের জানা ছিল।

চক্‌মকি নামে এক রকম পাথর আছে। এই পাথরের গুণ হচ্ছে এই, যে, যদি এর একটা টুক্‌রো খুব জোরে কোন কঠিন জিনিষে ঘষা যায়, তা হ'লে এং থেকে এক রকম আগুণের সৃষ্টি হয়ে থাকে। বল্‌টিক সাগরের তীরে আর এক রকম হল্‌দে রঙের পাথর দেখা যায়। এ পাথরের নাম অ্যাম্বার (Amber)। সে পাথরও চক্‌মকি পাথরেরই মত। সে পাথরও কোন কঠিন জিনিষে ঘষ্‌লে তা থেকে আগুণ বেরোয়। প্রাচীন সময়ে গ্রীস দেশের লোকেরা এই পাথরের গুণের কথা জান্‌তেন। গ্রীক ভাষায় অ্যাম্বার পাথরকে বলে "ইলেকট্রন্‌"।* এই ইলেকট্রন্‌ শব্দ থেকেই ইংরিজী "ইলেকট্রিসিটী" শব্দটা এসেছে।

---

* আজকাল ইলেকট্রন বল্‌লে অন্য জিনিষ বোঝায়। সে বিষয়ে মাদাম কুরীর গল্পে আলোচনা করা হয়েছে।

মেঘলা আকাশের বুকে হঠাৎ যে আঁকা বাঁকা অতি উজ্জ্বল আলোক রেখা সৃষ্টি হয় তা-ও যে ইলেকট্রিসিটী বা বিদ্যুৎ শ্রেণীরই একটা পদার্থ একথা বহুদিন পর্য্যন্ত মানুষ জানে নি। মাত্র কিছুকাল পূর্ব্বে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন নামে একজন আমেরিকান বৈজ্ঞানিক এ সত্য প্রমাণ করেন। তাঁর এই আবিষ্কারের কাহিনীটীও ভারী অদ্ভুত।

অ্যাম্বার (Amber) পাথর ঘষ্‌বার ফলে যে বিদ্যুৎ তৈরী হয়—আর বর্ষার মেঘলা আকাশে যে তীব্র আলোক রেখা দেখা যায়—এই উভয়ের মধ্যে অনেক বিষয়ে কতকগুলি সাদৃশ্য আছে। যেমন—উভয় আলোকেরই গতি আঁকা বাঁকা, উভয় আলোকই জ্বলে উঠ্‌বার সময় পরিমাণে খুব বেশী হলে অনেক সময় শব্দ হয়, উভয় আলোকেরই পোড়াবার ক্ষমতা আছে। এই রকম আরও সব। এ সব লক্ষ্য করেই বৈজ্ঞানিকদের মনে কেমন একটা সন্দেহ হয়েছিল যে, তা হলে আকাশের ঐ আলোক রেখাও হয়ত বা বিদ্যুৎ। এদের মধ্যে ফ্রাঙ্কলিনও একজন। তিনি তাঁর সন্দেহটা সত্যি কিনা পরীক্ষা করবার জন্য অদ্ভুত এক উপায় বার করলেন।

তিনি চিন্তা করে স্থির করলেন, উভয় আলোক সত্যি সত্যি একই পদার্থ কিনা তা পরীক্ষা করতে হলে আকাশের

আলোককে হাতের মুঠোর মধ্যে না পেলে কি করে আর পরীক্ষা চল্‌তে পারে! সুতরাং এ আলোককে আকাশ থেকে নামিয়ে আন্‌তে হবে।

এইখানে তোমাদের আর একটা কথা জেনে নেওয়া দরকার—বিদ্যুৎ জিনিষটা সব জিনিষের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে না। কোন কোন জিনিষের মধ্য দিয়ে অতি সহজেই প্রবাহিত হয়, যেমন—তামা। আবার কোন কোন জিনিষ আছে যার ভিতর দিয়ে একেবারেই প্রবাহিত হতে পারে না, যেমন—রেশম।

ফ্রাঙ্কলিন স্থির করলেন যে, মেঘের রাজ্যে একদিন একটা ঘুড়িকে উড়িয়ে দিয়ে তারই সাহায্যে সেখান থেকে বিদ্যুৎকে ধরে আন্‌বেন। যেই কথা সেই কাজ। তিনি উদ্বিগ্ন চিত্তে আকাশে মেঘের জন্য অপেক্ষা করতে লাগ্‌লেন।

কয়েকদিন অপেক্ষা করবার পর, একদিন মেঘে মেঘে আকাশ গেল ছেয়ে—জোরে বইতে লাগ্‌লো হাওয়া। ফ্রাঙ্কলিন পূর্ব্বেই একখানা রেশমের ঘুড়ি তৈরী করে রেখে-ছিলেন। সেখানা হাতে নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। সেই পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধকে ঘুড়ি ওড়াবার জন্য বেরুতে দেখে ছেলের দল একেবারে ক্ষেপে গেলো। তারা তাঁর পেছনে

পেছনে ছুটলো কৌতূহলী হয়ে হৈ চৈ করতে করতে। এতে তিনি মাত্রই ভ্রূক্ষেপ করলেন না।

তিনি মাঠে এসে ঘুড়ির সঙ্গে প্রথমেই একখণ্ড তামার তার বেঁধে নিলেন। তারপর ওড়াবার জন্য ঘুড়ির সঙ্গে বাঁধলেন পাটের শক্ত লম্বা সূতো। যে জায়গায় সূতোটা তাঁর হাতে থাক্‌বে—সেখানটায় সূতোর পরিবর্ত্তে রেশমের ফিতে বাঁধা হলো। আর সূতো ও রেশমের গাঁঠ যেখানে দেওয়া হয়েছিল, সেখানে বাঁধ্‌লেন একটা ধাতুর তৈরী চাবী। এই সমস্ত ঠিকঠাক করে তিনি বসে রইলেন।

আকাশে কিছুকালের মধ্যেই বিদ্যুৎ চমকানো সুরু হলো। অমনি তাড়াতাড়ি করে তিনি ঘুড়িখানা উড়িয়ে দিলেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে জোর বাতাসে ঘুড়ি একেবারে উঠ্‌লো গিয়ে মেঘের রাজ্যে। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎও ঘুড়ির ওপর দিয়ে ঝলক দিয়ে গেলো। কিন্তু কিছুই হলো না। ব্যাপার দেখে তিনি একেবারে দমে গেলেন। মনে মনে ভাব্‌লেন—তাহ'লে তিনি যা সন্দেহ করেছেন তা কি মিথ্যা! যদি আকাশের ঐ আলো সত্যি সত্যি বিদ্যুৎ হয়ে থাকে তবে ঘুড়ির সূতোর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নীচে না নেমেই পারবে না। কারণ বিদ্যুৎ তার বাহনকে অবলম্বন করে প্রবাহিত হয়, এ-ত একেবারে বহু-পরীক্ষিত সত্য।

এই কারণেই তিনি ঘুড়ির সঙ্গে তামার তার বেঁধে দিয়েছিলেন।

পূর্ব্বেই তোমাদের বলেছি যে, তামার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ অতি সহজে প্রবাহিত হয়। তামার তার ও পাটের সূতোর ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ নেমে এসে ধাতু নির্ম্মিত চাবীর মধ্যে স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি করবে। আর যাতে সূতোর ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ নেমে এসে সরাসরি তাঁর শরীরে ঢুকে মাটীতে প্রবেশ করতে না পারে এজন্য গোড়ায় রেশমের ফিতে বেঁধে নিয়েছিলেন। তোমরা জানো যে, রেশমের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে না। এই সব কারণেই তিনি ঘুড়ির সঙ্গে নানা রকম জিনিষ জুড়ে দিয়েছিলেন। যাক সে কথা—আবার ঘুড়ির ওপর দিয়ে বিদ্যুৎ ঝলক দিয়ে গেলো। এবারে ঘুড়ির সঙ্গে বাঁধা সূতো একেবারে শক্ত হয়ে নড়তে সুরু করলো। তিনি ব্যাপার দেখে কম্পিত হৃদয়ে চাবীটাকে আঙ্গুল দিয়ে স্পর্শ করলেন। স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গেই একটা বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ লাফিয়ে পড়লো। এই সময়ই আবার সুরু হলো বৃষ্টি। সূতো জলে ভিজে গেলো। যতক্ষণ সূতো শুক্‌নো ছিল ততক্ষণ ওর ভিতর দিয়ে ভালো করে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে নি। সূতো ভিজ্‌বামাত্রই ওর মধ্য দিয়ে জোরে বিদ্যুৎ প্রবাহিত

হতে সুরু করলো। ফ্রাঙ্কলিন আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। আজ তাঁর জীবনের শুভ দিন। আজ তিনি এক মহাসত্য আবিষ্কার করেছেন।

ফ্রাঙ্কলিন আরও নানাভাবে পরীক্ষা করে দেখলেন যে, তাঁর সন্দেহই সত্য। মেঘলা আকাশের ক্রোড়ে যে তীব্র আলোক-রেখা দেখা যায় তা বিদ্যুৎ ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই থেকেই তিনি প্রমাণ করলেন যে, পৃথিবীর সমস্ত জিনিষেই কম বা বেশি পরিমাণ বিদ্যুৎ আছে। ঘষ্‌বার ফলে প্রত্যেক জিনিষ থেকেই কম বা বেশী বিদ্যুৎ পাওয়া যেতে পারে। আকাশে দুই খণ্ড মেঘ যখন পরস্পর বিপরীত দিক থেকে ভাস্‌তে ভাস্‌তে একে অপরের সঙ্গে এসে প্রবল বেগে ধাক্কা খায়, তখনই এই আলোক রেখা উৎপন্ন হয়।

এইরূপে ঘুড়ির সাহায্যে প্রকৃতির অসীম রহস্যের কতটুকু সমাধান করে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

বিদ্যুৎ সম্বন্ধে গবেষণা করে করে ফ্রাঙ্কলিন এ সম্বন্ধে আরও বহু নূতন তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন। আজকাল বিদ্যুতের সাহায্যে মানুষ অসম্ভবকে যে সম্ভবে পরিণত

করতে সক্ষম হচ্ছে তার আরম্ভ হয়েছিল এই ফ্রাঙ্কলিনের হাতেই। অবশ্য পরে আরও নানাজনে নানাভাবে এর আরও অনেক উন্নতি করে গিয়েছেন এবং এখনও পণ্ডিতেরা এ সম্বন্ধে গবেষণা করে করে বহু নূতন তথ্য আবিষ্কার করছেন।

ফ্রাঙ্কলিনের জন্ম হয়েছিল দরিদ্রের ঘরে। তিনি যে জ্ঞান অর্জ্জন করেছিলেন তা শুধু তাঁর নিজের চেষ্টায়। তিনি যে শুধু বৈজ্ঞানিকই ছিলেন তা নয়, তিনি দার্শনিক এবং তাঁর স্বদেশের একজন নেতাও ছিলেন। তিনি তাঁর স্বদেশের উন্নতির জন্যও নানাভাবে চেষ্টা করে গিয়েছেন।

দাতা নোবেল

নোবেল পুরস্কারের কথা তোমরা অতি অবশ্য শুনেছ। আমাদের দেশের দু'জন মনীষী এই পুরস্কার লাভ করে, জগতবাসীর কাছে আমাদের দেশের মর্য্যাদা বিশেষরূপে বৃদ্ধি করেছেন। এঁদের দু'জনের নামই তোমরা হয়ত জানো। এঁদের মধ্যে একজন হ'চ্ছেন আমাদেরই বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ। এঁর কবিতা তোমরা নিশ্চয় পড়েছ। ইনি এঁর অপূর্ব্ব সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য এই পুরস্কার লাভ করেছেন। আর অপর জন বৈজ্ঞানিক। এঁর নাম স্যর চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামণ। ওঁর বাড়ী মাদ্রাজে। বিজ্ঞানের একটী মৌলিক আবিষ্কারের জন্য ইনি এই পুরস্কার পেয়েছেন। এঁর আবিষ্কার-কাহিনী ও জীবনী এ বইয়েরই শেষের দিকে আছে। তা পড়্‌লেই তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা জান্‌তে পারবে।

নোবেল পুরস্কার সম্বন্ধে হয়ত তোমাদের অনেকেরই খুব সুস্পষ্ট ধারণা নেই। সুইডেনে একজন বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তাঁর নাম এলফ্রেড নোবেল। তিনি ব্যবসা করে অগাধ অর্থ অর্জ্জন করেছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর অর্জ্জিত সম্পত্তির অধিকাংশই (কয়েক কোটী টাকা দাম হ'বে) জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে প্রত্যেককে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চায়

উৎসাহ দেওয়ার জন্য, একটী সমিতি গঠন করে তার হাতে দিয়ে গিয়েছেন। পৃথিবীর যে কোন দেশের যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী লোকই যোগ্যতা থাক্‌লে এই পুরস্কার পাবার অধিকারী হতে পারবে। রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, চিকিৎসা-বিজ্ঞান বা শারীরবিজ্ঞান, সাহিত্য এবং বিশ্বে শান্তি স্থাপন—এই পাঁচটী বিভিন্ন বিষয়ে যাঁরা নূতন কথা কিছু শোনাতে পারবেন—তাঁরাই এই পুরস্কার পাবার অধিকারী হবেন। অবশ্য পুরস্কার দেওয়ার চূড়ান্ত মীমাংসার ভার নোবেল যে সমিতির হস্তে টাকা গচ্ছিত রেখে গেছেন—সেই সমিতিরই ওপরে। আমাদের দেশের টাকায় এর প্রত্যেকটী পুরস্কারের মূল্য এক লক্ষ কুড়ি হাজার। যদি কোন বিষয়ে কোন বৎসর কাকেও পুরস্কার পাবার যোগ্য বলে ঐ সমিতি বিবেচনা না করে তা হ'লে সে বিষয়ের পুরস্কার আর ঐ বৎসর দেওয়া হয় না। আবার একই বৎসরে একই বিষয়ে দু'জনকে যোগ্য বলে বিবেচনা করলে, দু'জনের মধ্যে পুরস্কারের টাকাটা ভাগ করে দেওয়া হয়।

তোমরা নিশ্চয়ই এই অগাধ সম্পত্তির দাতা এলফ্রেড্ নোবেলের পরিচয় জান্‌বার জন্য খুব কৌতূহল বোধ কর্‌ছো। এমন মহৎ হৃদয় লোকের কথা জান্‌বার জন্য সবারই কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক।

নোবেল ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার এবং রাসায়নিক। ডিনামাইটের নাম তোমরা শুনে থাকলেও থাকতে পার। ডিনামাইট এক প্রকার ভীষণ বিস্ফোরক। পাহাড়, পর্ব্বত, গ্রাম, সহর সব কিছুই এর সাহায্যে একদম উড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যেতে পারে। এমনি ভীষণ শক্তিশালী ও মারাত্মক এই জিনিষটী। এই জিনিষটীই আবিষ্কার করেছিলেন এলফ্রেড নোবেল।

বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে এলফ্রেড নোবেল এই অতি প্রয়োজনীয় আবিষ্কারটী করেন। তাঁর এই আবিষ্কারের ফলে, সে সময়ে জগতে একটা বিষম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল।

ডিনামাইট আবিষ্কারের ফলে পাহাড় পর্ব্বত উড়িয়ে, তার ভিতর দিয়ে, রেলপথ তৈরী করবার খুবই সুবিধা হয়েছে। পাহাড়ের ভিতর দিয়ে এক দেশ থেকে আব এক দেশে যাবার জন্য যে টানেল বা সুড়ঙ্গ তৈরী করে, রেল পথ বসান হয় সে কথা তোমরা হয়ত শুনে থাকবে। এবং কেউ কেউ হয়ত, এই সুড়ঙ্গ বা টানেল দেখেও থাকবে। আমাদের দেশে আসামের কয়েক জায়গায় এই রকম টানেল আছে। তা ছাড়া গয়া, জামালপুর, হরিদ্বার প্রভৃতি আরও অনেক জায়গায় টানেল দেখতে পাওয়া যায়।

পূর্ব্বে পাহাড়-পর্ব্বতের ওপর দিয়ে রাস্তা তৈরী করা—বিশেষ করে রেলপথের জন্য সুড়ঙ্গ তৈরী করা একেবারেই অসম্ভব ছিল। যদি কোদাল বা শাবল দিয়ে পাথর কেটে কেটে পাহাড়ের ওপর দিয়ে রাস্তা তৈরী করতে হয় তা হলে ত বুঝ্‌তেই পার কেমন পরিশ্রম—আর কত সময়ের দরকার। এরকম ভাবে পাথর কেটে কেটে রাস্তা তৈরী করা একরকম অসম্ভব বল্‌লেও চলে।

পাহাড়ের ওপর দিয়ে ছাড়া যে সব দেশে যাওয়ার আর কোন উপায়ই ছিল না—এখন এই টানেল তৈরী করবার ফলে রেলগাড়ীতে চড়ে অতি অনায়াসে সে সব দেশে যাওয়া যেতে পারে। আজ যদি মানুষ ইচ্ছা করে যে, হিমালয়ের ওপর দিয়ে সোজা চীনে যাওয়ার জন্য রেলপথ তৈরী করবে তাহলেও খুব বেশী অসুবিধায় পড়্‌তে হ'বে না। ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় ভেঙ্গে উড়িয়ে দিয়ে সুড়ঙ্গ তৈরী করে নিলেই হলো।

ডিনামাইট আবিষ্কার হওয়ার ফলে, কামান, বন্দুক প্রভৃতি যুদ্ধ করবার অস্ত্রগুলিরও খুব উন্নতি করা সম্ভবপর হয়েছে। এর সাহায্যে বন্দুক ও কামানের গোলাগুলী বহু দূরে ছুঁড়ে দেওয়া যায়। এইজন্য আজকাল বহু দূরে থেকেও দুই দল শত্রু অতি অনায়াসে যুদ্ধ করতে পারে। পূর্ব্বে সে

সুবিধা ছিল না। পূর্ব্বে যুদ্ধ করতে হোত কাছে কাছে থেকে। একদল সৈন্য আর একদলের কাছে এগিয়ে না আস্‌লে যুদ্ধ করা সম্ভব হোত না, কারণ অস্ত্র ছুঁড়ে খুব বেশী দূরে পাঠানো সম্ভব ছিল না। আজকাল ডিনামাইটের চেয়েও মারাত্মক অতি ভীষণ ভীষণ নানারকম সব যুদ্ধাস্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে সত্য: কিন্তু তা হলেও ডিনামাইটের ব্যবহার একটুকুও কমে নি।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের একুশে অক্টোবর সুইডেনের রাজধানী ষ্টকহল্‌মে এলফ্রেড নোবেলের জন্ম হয়। ইনি ছিলেন এঁর পিতার তৃতীয় পুত্র। বাল্যকাল থেকেই ইনি খুব রোগা ছিলেন। এজন্য এঁর বিদ্যালয়ে পাঠের সুযোগ বড় একটা ঘটে নি। তিনি ছেলেবেলায়ই তাঁর বাবার সঙ্গে রাশিয়ার রাজধানী সেণ্টপিটার্সবার্গে চলে আসেন। এখানে তাঁর বাবার ছিল একটা টরপেডো তৈরীর কারখানা। টরপেডো কাকে বলে তোমরা সকলে হয়ত জানোনা। এ-ও একরকম যুদ্ধে ব্যবহার করবার অস্ত্র। জল-যুদ্ধেই এ জিনিষটীর ব্যবহার হয়ে থাকে। সংকীর্ত্তনে যে মৃদঙ্গ বাজান হয়, সেই মৃদঙ্গেরই মত একরকম ধাতুর খোল তৈরী করে তার মধ্যে বারুদ পূরে এ জিনিষটী তৈরী করা হয়। এই মারাত্মক অস্ত্রটী জলের নীচ দিয়ে অতি বেগে

ছুটে যেতে পারে। জাহাজ ইত্যাদি ধ্বংস কর্‌বার কাজেই এ অস্ত্র ব্যবহার হয়ে থাকে।

নোবেল বাল্যকালে তাঁর বাবার এই টরপেডোর কারখানায় এইসব অস্ত্র তৈরীর কাজ শিখতেন। কিছুকাল সেখানে কাট্‌বার পর নোবেলের বাবা তাঁর দ্বিতীয় পুত্রের ওপর এই কারখানার তত্ত্বাবধানের ভার দিয়ে দেশে ফিরে এলেন। নোবেলকেও নিয়ে এলেন সঙ্গে করে।

দেশে ফিরে নোবেল বিস্ফোরক পদার্থ সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করলেন। নাইট্রোগ্লিসিরিন নামে এক রকম ভীষণ বিস্ফোরক ইতি পূর্ব্বেই আবিষ্কৃত হয়েছিল। এ জিনিষটীও অতি ভীষণ মারাত্মক। কখন যে কি একটা ভীষণ কাণ্ড এ জিনিষটী ঘটিয়ে বসে কিছুই বলা যায় না। তাই এ জিনিষ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হয় ভারী সন্তর্পণে। তিনি এই ভীষণ জিনিষটা নিয়েই পরীক্ষা করতে স্থুরু করলেন।

পরীক্ষা করে নোবেল বুঝ্‌লেন যে, নাইট্রোগ্লিসিরিন খুবই শক্তিশালী বিস্ফোরক। কিন্তু তরল বলে এ জিনিষটী কোন রকম বিস্ফোরণের কাজে ব্যবহার করবার নানারকম বিপদ রয়েছে। সকল সময়ই জিনিষটীকে বোতলের মধ্যে পূরে রাখতে হয়। যদি কোনক্রমে

বাইরে আস্‌তে পারে তা হলে যে কি অনিষ্ট করে বস্‌বে তা বলা যায় না। এজন্যই একে কি করে কাজে লাগাবার উপযোগী করে নেওয়া যায়, সেই নিয়ে তিনি পরীক্ষা কর্‌তে লাগ্‌লেন।

এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন ঘটে গেলো একটি অভাবনীয় কাণ্ড। যার ফলে নোবেল আবিষ্কার করে বস্‌লেন ঐ অতি প্রয়োজনীয় মারাত্মক ডিনামাইট !

ঘটনাটা এই রকম—একদিন কাজ করবার সময় নোবেলের একজন সহকারীর হাত থেকে ফস্‌কে একটা বোতল হ'তে অনেকটা নাইট্রোগ্লিসিরিন বালির ওপরে পড়ে যায়। লোকটা ব্যাপার দেখে ত ভয়েই একেবারে অস্থির! সে মনে মনে ভাব্‌লে এখনই হয়ত একটা এমন বিস্ফোরণ হবে যার ফলে পরীক্ষাগারের বাড়ীঘর একেবারে উড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এই কথা ভেবেই সে ভয়ে চীৎকার করে উঠ'লো। নোবেল ছিলেন কাছেই। তিনি ছুটে এলেন। ব্যাপার দেখে তিনিও যে একটু ভয় না পেলেন তা নয়। তিনি কি করবেন স্থির করতে না পেরে হতভম্ব হয়ে ঐ জিনিষটার দিকে কিছু সময় তাকিয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ ঐভাবে কাটবার পর তিনি কতকটা আত্মস্থ হয়ে ভাব্‌লেন—"ব্যাপার খানা কি! এমন ভীষণ জিনিষ

বালির ওপরে পড়ে যে একেবারেই চুপচাপ! তাহ'লে কি ওটা নাইট্রোগ্লিসিরিন নয়।" তিনি সন্ধান করে দেখ্‌লেন যে জিনিষটা নাইট্রোগ্লিসিরিনই। তখন তিনি একটু সমস্যায় পড়ে গেলেন। অতি সন্তর্পণে বালিশুদ্ধ ঐ জিনিষটা হাতে তুলে নিলেন। নিয়েই চলে এলেন পরীক্ষাগারে।

সেখানে পরীক্ষা করে তিনি বুঝ্‌তে পারলেন—যে এমন কোন জিনিষ যার শোষণ করবার শক্তি আছে তার সঙ্গে যদি নাইট্রোগ্লিসিরিন মিশিয়ে নেওয়া যায়, তা হ'লে এই ভীষণ জিনিষটীকে বেশ্‌ ভালরকমেই বশে আনা যেতে পারে। এবং এরই সাহায্যে এরূপ মারাত্মক বিস্ফোরক তৈরী করা যাবে যা' দিয়ে পাহাড় পর্ব্বত অতি অনায়াসে উড়িয়ে ধ্বংস করে দেওয়া যেতে পারবে। তিনি ভাব্‌লেন, পাহাড় পর্ব্বত উড়িয়ে দেবার মত শক্তিশালী বিস্ফোরক আবিষ্কার করতে পারলে মস্তবড় একটা কাজ হবে। এ ব্যাপারটা বুঝ্‌তে পেরেই তিনি এক নূতন কল্পনায় মেতে উঠ্‌লেন। তিনি আরও পরীক্ষা করে বুঝ্‌তে পারলেন, বালির সঙ্গে নাইট্রোগ্লিসিরিন মিশিয়ে বিস্ফোরক তৈরী করা যায় বটে; কিন্তু সকল সময় তা থেকে

খুব ভাল কাজ পাওয়া যায় না। যারা এ জিনিষ ব্যবহার করবে তাদের সময় সময় বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা হতে পারে। তাই তিনি আবার অন্য জিনিষ নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করলেন। এবারে তিনি কেইসেলগার নামক এক রকম অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র বিশিষ্ট বেলে পাথর নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করলেন। এতে খুবই ভাল ফল পাওয়া গেল। এবারে জিনিষটা খুব নিরাপদও হোল। তিনি এরই নাম দিলেন ডিনামাইট। ডিনামাইটের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে নোবেলের খ্যাতিও চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। এবং ডিনামাইট বিক্রী করে তাঁর আয়ও হতে লাগ্‌লো খুবই বেশী।

ডিনামাইট আবিষ্কার করেই যে তিনি চুপচাপ বসে ছিলেন তা নয়। তিনি নাইট্রোগ্লিসিরিন নিয়ে আরো নানা রকম পরীক্ষা সুরু করলেন। গানকটন (Gun cotton) নামে একটা জিনিষ নাইট্রোগ্লিসিরিনের সঙ্গে মিশিয়ে তিনি জেলির মত এক রকম ভীষণ বিস্ফোরক তৈরী করলেন। এ জিনিষটা ডিনামাইটের চেয়ে আরও বেশী শক্তিশালী হোল। পৃথিবীতে এর চেয়ে অধিক শক্তিশালী বিস্ফোরক খুবই কম আছে। তিনি এসব ছাড়া আরও বহু রকম বিস্ফোরক আবিষ্কার করেছিলেন। তার মধ্যে ধূমহীন বারুদও একটী।

দাতা নোবেল

পৃথিবীতে যুদ্ধ ত আজকাল একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। কে কার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে বড় হবে তাই নিয়েই ঝগড়া বাঁধবার ফলে এই সব যুদ্ধ ঘটে থাকে। এসব যুদ্ধে কত হাজার হাজার লোক নিহত হয়। এসব যুদ্ধে মানুষ মারবার যে সব ভীষণ মারাত্মক গোলাগুলী ও অস্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে তার অনেকগুলিই নোবেলের আবিষ্কৃত।

সারাটা জীবন শুধু এই সব ভীষণ ভীষণ মানুষ মার্‌বার কল আবিষ্কার করে শেষ জীবনে তাঁর ভারী অনুশোচনা হয়েছিল। তাই তিনি পৃথিবীতে যাতে যুদ্ধ না বাঁধতে পারে এজন্য যাঁরা চেষ্টা করে পৃথিবীতে শান্তি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবেন, অন্যান্য পুরস্কারের সঙ্গে তাঁদের জন্যও একটী পুরস্কারের ব্যবস্থা করে গিয়েছেন।

মানুষের বন্ধু

বেশি দিনের কথা নয়—মাত্র পঞ্চাশ বৎসর আগেকার কথা।

একদিন ছয়টী ছোট ছোট ছেলে পাহাড়ের ওপরে ভেড়ার পাল চর্‌তে দিয়ে, একটা গাছের ছায়ায় বসে খেলা কর্‌ছিলো। এমনি সময় একটা কুকুর সাঁ সাঁ করে তাদের দিকে ছুটে আসতে লাগ্‌লো। কুকুরটার রোগা চেহারা, আর মুখ থেকে অবিশ্রান্ত ফেনার মত লালা ঝর্‌তে দেখেই, ছেলের দল বুঝ্‌তে পার্‌লো যে, কুকুরটা পাগল। তখন তা'রা মনে মনে প্রমাদ গুণ্‌লো। সুতরাং সবাই চট্‌পট্ উঠে দিলো ভোঁ দৌড়। ওদের ভিতর জুপিলের বয়স ছিলো একটু বেশি—সে পেছনে থেকে ওদের রক্ষা কর্‌তে কর্‌তে চল্‌লো। এদিকে পাগ্‌লা কুকুরটা ছুটে এসে জুপিলকে সাম্‌নে পেয়ে, তাকেই কাম্‌ড়াতে সুরু কর্‌লো।

জুপিল ভয় পেয়ে কিন্তু কুকুরটার কাছে অমনি আত্ম-সমর্পণ কর্‌লো না। সে তার সঙ্গে রীতিমত যুঝ্‌তে লাগ্‌লো। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে কুকুরটাকে কাবু করে মাটীতে ফেলে একেবারে চেপে ধর্‌লো। এদিকে কুকুরের কামড়ে তার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে, তবু তার ভ্রুক্ষেপ নেই—সে কুকুরটাকে চেপেই ধরে আছে। এমনি সময় জুপিলের ছোট

ভাই দূর থেকে ব্যাপারটা দেখে তার ভেড়া তাড়াবার লাঠিটা নিয়ে ছুটে এসেই কুকুরটার মুখের ওপরে সপাং সপাং ঘা মারতে সুরু করলো। মার খেয়ে কুকুরটা পালিয়ে গেলো।

জুপিল তা'র সঙ্গীদের রক্ষা করবার জন্য যে সাহস দেখিয়েছিলো, তা' সত্যি সত্যিই যে বিশেষ করে প্রশংসা পাবার যোগ্য—সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। যাক্— এরপর ধরাধরি করে ত তা'কে বাড়ীতে আনা হলো। জুপিলের সারাদেহে কুকুরে কামরাবার ভীষণ ঘা গুলো দেখে তা'র বাবা আর মা ভয়ে একেবারে শিউরে উঠ্লেন।

'এরপর যখন এই ঘাগুলো বিষাক্ত হয়ে জলাতঙ্ক রোগ হবে, তখন আর ওকে বাঁচানো যাবে না।'— এই চিন্তায়ই তা'রা আকুল হয়ে কান্না আরম্ভ করে দিলেন।

ক্রমে এই ব্যাপারটা গ্রামের মোড়লের কানে গেলো। তিনি এসে বল্লেন—"ভয় নেই—প্যারিসে আমার এক ডাক্তার-বন্ধু আছেন—তাঁ'র নাম লুই পাস্তুর। অল্পদিন হলো তিনি এই জলাতঙ্ক রোগের এক নূতন ওষুধ আবিষ্কার করেছেন।" মোড়লের কথা অবহেলা করা চলে না— সুতরাং জুপিলকে চিকিৎসার জন্য লুই পাস্তুরের কাছে প্যারিসেই পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

এর পূর্ব্বে পাস্তুর মাত্র এই ব্যারামের আর একটী রোগীর চিকিৎসা করে তা'কে আরোগ্য করেছিলেন। তা' হ'লেও তাঁ'র নিজের আবিষ্কৃত চিকিৎসা-প্রণালীর ওপরে তা'র যে খুব বিশ্বাস ছিলো—তা' নয়। তাই তিনি প্রথমে ইতস্ততঃ কর্‌তে লাগ্‌লেন যে, তিনি এই নূতন রোগীটীর চিকিৎসার ভার গ্রহণ কর্‌বেন কি না! এই কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে তিনি তাঁর পরীক্ষাগারের এপাশে ওপাশে চিন্তিত মনে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লেন। বহুক্ষণ ভেবেও তিনি কিছু স্থির কর্‌তে না পেরে তাঁর সহকর্ম্মীদের সঙ্গে পরামর্শ কর্‌তে ছুট্‌লেন। তাঁ'দের কিন্তু পাস্তুরের নূতন আবিষ্কৃত চিকিৎসা-প্রণালীর ওপরে অগাধ বিশ্বাস ছিলো। তাই তাঁ'রা এ বালকটীর চিকিৎসার ভার গ্রহণ কর্‌বার জন্য তাঁকে বিশেষ উৎসাহ দিতে লাগ্‌লেন। তাঁ'দের উৎসাহ পেয়ে, তিনি ওর চিকিৎসার ভার নিলেন।

এরপর জুপিলকে ইন্‌জেক্‌সন্ দেওয়া হ'লো—এক দিন, দু' দিন করে এক সপ্তাহ; দশ দিন—পনের দিন কেটে গেলো—তবু জুপিলের শরীরে জলাতঙ্ক রোগের কোন লক্ষণ প্রকাশ পেলো না। পাস্তুর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌লেন। এ কয়দিন যে, পাস্তুরের কি ভাবে দিন-রাত্রি কেটেছে—সে জানেন শুধু এক ভগবান্। দিন নেই, রাত্রি নেই—আহার নেই, নিদ্রা নেই—পাস্তুর তাঁ'র পরীক্ষাগারে বসে বসে শুধু

যন্ত্রপাঁতি নিয়ে এক ওষুধের সঙ্গে আর এক ওষুধ মিশিয়ে পরীক্ষা করেছেন—আর মাঝে মাঝে সেই ওষুধগুলি জুপিলের শরীরে ইন্‌জেক্‌সন্ করে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। কাজ কর্‌তে কর্‌তে পরীক্ষাগারের টেবিলের ওপরেই মাথা রেখে তিনি ঘুমিয়ে পড়্‌তেন—আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখ্‌তেন—'ছোট্ট একটী ছেলে, মৃত্যু-যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে তাঁ'র পায়ের তলায় বসে কাঁদ্‌ছে—ওঃ কী করুণ সে কান্নার সুর!' সে সুরে এই দরদী "মানুষের বন্ধুর" ঘুম ঘুচে যেতো। তিনি ধড়মড়িয়ে উঠে আবার যন্ত্রপাঁতি নিয়ে পরীক্ষা কর্‌তে বসে যেতেন। তাঁ'র মনে শুধু এই চিন্তা—"এ বালককে যেমনি করেই হোক বাঁচাতেই হবে।" বাঁচাতে তিনি পার্‌লেনও। প্রায় মাসখানেক সময় যখন পার হয়ে গেলো—তখন সকলেই বুঝ্‌লো যে, আর ভয়ের কোন কারণ নেই।

জুপিল আরোগ্য লাভ করে আবার তাঁ'র বাবা ও মায়ের কাছে ফিরে গেলো। এই যে এত বড় একজন ডাক্তার বা বৈজ্ঞানিক যা-ই বলি—এঁর জীবন-কথা—ইনি কি করে—কি কি সব ব্যারামের ওষুধ আবিষ্কার করে গেছেন—তা শুন্‌তে নিশ্চয়ই তোমাদের সবারই আগ্রহ আছে।

পাস্তুরের বাবা ছিলেন, নেপোলিয়ানের সৈন্যবিভাগে সার্জেণ্ট-মেজর। চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করে, তিনি

ফরাসী দেশের অন্তর্গত জুরা প্রদেশে বাস কর্‌তে আরম্ভ করেন। এইখানেই পাস্তুরের জন্ম হয়।

ছেলেবেলায় পড়াশুনোতে তাঁ'র মনোযোগ একেবারে ছিলো না বল্লেও চলে। সে সময় যা' কিছু তাঁ'র ঝোঁক ছিলো—তা' শুধুমাত্র ছবি আঁকার দিকে। ছেলের পড়াশুনোতে অমনোযোগ দেখে, তাঁ'র বাবা ছেলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ শঙ্কিত হয়ে উঠ্‌লেন।

তিনি মনে মনে ভাব্‌লেন,—'না, এমনভাবে হাল ছেড়ে দিলে ত ছেলেটা কালে একটা গণ্ডমূর্খ হবে।' তাই তিনি জোর করে তাঁ'কে পড়্‌বার জন্য "একোলে নৰ্ম্ম্যাল" নামক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করে দিলেন। দিলে কি হবে! পড়াশুনোয় তাঁ'র মন মাত্রই বস্‌লো না। তিনি পালিয়ে বাড়ী ফিরে এলেন। কিছুদিন বাড়ী বসে আবার ছবি আঁকা চল্‌লো। এরপর আবার তাঁকে আর একটা বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করে দেওয়া হলো। সেখানে ভর্ত্তি হয়েই তাঁর উন্নতির সূচনা হলো। সেখানে ভর্ত্তি হয়ে তাঁ'র বিজ্ঞানচর্চ্চার দিকেই বিশেষ ঝোঁক গেলো। ক্রমে সম্মানের সঙ্গে তিনি সেই বিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'লেন। এরপর তিনি বিজ্ঞানচর্চ্চার তৎকালীন শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ "একোলে নৰ্ম্ম্যালএ" আবার প্রবেশ কর্‌লেন।

সেখানে বড় বড় বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে বিজ্ঞান চর্চ্চা করে তিনি অনেক নূতন জ্ঞান লাভ করলেন। এই সময় তিনি প্রায় সকল সময়েই পরীক্ষাগারে বসে নূতন বৈজ্ঞানিক-তথ্য আবিষ্কারের চেষ্টা করতেন। ক্রমে তিনি এমন একটা পদার্থ আবিষ্কার করে ফেললেন যে, যার খোঁজ এর পূর্ব্বে আর কেউ-ই পান নি। সেই আবিষ্কারে তিনি কোন একটা রাসায়নিক পদার্থ সম্বন্ধে মানুষের ধারণাই একেবারে বদলে দিলেন; পাস্তুরের যশ সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লো।

এরপর তিনি লীল্ কলেজে অধ্যাপকের চাকুরী গ্রহণ করেন। লীল্ শহর মদ তৈরীর জন্য বিখ্যাত। সে সময় মদওয়ালারা মদ তৈরী করে রেখে দিতো—আর অল্পদিন পরেই সেই মদ পঁচে একেবারে নষ্ট হয়ে যেতো। এই কারণে মদওয়ালাদের ভারী লোক্‌সান্ হতো। এই ব্যাপারটা পাস্তুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। তিনি ভাবতে ভাবতে স্থির করলেন—শুধু মদই ত নয়, পৃথিবীর সকল রকম জিনিষই ত পঁচে নষ্ট হয়ে যায়। কেন এমন হয়? তিনি পরীক্ষা করে করে ঠিক করলেন যে, এক প্রকার ছোট ছোট পোকা জিনিষের মধ্যে প্রবেশ করে, সেগুলোকে বিকৃত ক'রে তোলে। এই জিনিষগুলোকে যদি এমনভাবে রাখা

যায়, যাতে তার মধ্যে কোন পোকা প্রবেশ করতে না পারে তা হ'লে আর সেগুলো পঁচবে না।

বোঝবার সুবিধার জন্য, এই আবিষ্কারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরও দু'একটা আবিষ্কারের কথা এখানে বলে নিতে হবে। পূর্ব্বে ক্ষতস্থান বা ঘা বিষাক্ত হয়ে বহু লোক মারা যেতো। ঘা বিষাক্ত হয় কি করে—তা হয়ত তোমরা সকলে জানো না। ছোট ছোট এক রকম পোকা আছে, ঐ পোকাগুলোই ঘায়ের ভেতর ঢুকে ঘা বিষাক্ত করে তোলে। তা'রা ঘায়ের মধ্যে ঢুকে সেখানে রীতিমত বাড়ীঘর তৈরী করে বাস করতে আরম্ভ করে —সেখানে ডিম পারে, তা' থেকে ছানা হয়। তা'দের বংশবৃদ্ধি এমন আশ্চর্য্য দ্রুতগতিতে হ'তে থাকে যে, শুনলে একেবারে অবাক্ হ'বে। প্রত্যেক মুহূর্ত্তে এক-একটা পোকা থেকে লক্ষ লক্ষ ছানা হয়। এই ভাবে বংশ বৃদ্ধি করে ঘায়ের মধ্যে ওরা এমন একটা কাণ্ড সুরু করে দেয় যে, অল্প সময়ের ভেতরেই ঘা-টা বিষাক্ত হয়ে, রোগীর জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন হয়ে ওঠে।

আকাশে, বাতাসে, জলে, স্থলে—সর্ব্বত্রই এই পোকা কোটীতে কোটীতে ঘূরে বেড়াচ্ছে। শুনে ভারী আশ্চর্য্য বোধ হয়—না? কেউ কেউ হয়ত মনে মনে ভাবছো —কোটীতে কোটীতে এই পোকা সর্ব্বত্র ঘূড়ে বেড়াচ্ছে—কই

আমরা ত একটাও দেখ্‌তে পাই না। ও পোকা এমনি ছোট যে, খালি চোখে দেখা যায় না।

তা'দের দেখ্‌তে হ'লে, একরকম কাঁচের দরকার হয়। সেই কাঁচের ভেতর দিয়ে ওগুলোকে দেখা যায়। খুব ছোট বলেই এই পোকাগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে—জীবাণু (জীব+অণু) ; অর্থাৎ ক্ষুদে প্রাণী। আর যে কাঁচের ভেতর দিয়ে এই পোকাগুলোকে দেখা যায় তা'কে বলে অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

যোশেফ্‌ লিষ্টার নামে একজন ডাক্তার, ঘা যা'তে বিষাক্ত না হতে পারে, সেই চিকিৎসা আবিষ্কার করেন। তিনিই আবিষ্কার করেন যে, কোন তেজস্কর পদার্থ ঘায়ে লাগালে, আর জীবাণু গিয়ে তা'র কোন অনিষ্ট কর্‌তে পার্‌বে না। সেই আবিষ্কারই পাস্তুরকে প্রথমে ভাবিয়ে তোলে যে, তাহলে বোধ হয় ঘা-ও যেমনি ভাবে বিষাক্ত হয়ে পঁচে—তেমনি ভাবে খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদিও পঁচে যায়।

আমাদের ভাব্‌তেও গা শিউরে ওঠে যে, সকল সময়েই লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী জীবাণু চারদিকে ঘূরে ঘূরে আমাদের স্বাস্থ্যহানির চেষ্টা কর্‌ছে! পাস্তুরই প্রথম আবিষ্কার করেন যে, মানুষের অনেক রকম ব্যারামই এই জীবাণুরা ঘটিয়ে থাকে।

পৃথিবীর মানুষকে সেই ভীষণ জীবাণুর আক্রমণ থেকে বাঁচাবার উপায় বা'র কর্‌তে তিনি চেষ্টা আরম্ভ কর্‌লেন। কি কর্‌লে জীবাণুগুলো মানুষের শরীরে প্রবেশ কর্‌তে না পারে, কি কর্‌লে অতি সহজে ওগুলোকে ধ্বংস করা যায়, এইসব তিনি চিন্তা কর্‌তে লাগ্‌লেন। সকল সময়ই যদি মানুষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, মানুষের সাধারণ স্বাস্থ্য যদি ভাল থাকে—তা' হ'লে জীবাণুরা সহজে আর কোন অনিষ্ট করতে পারে না। কারণ সুস্থ শরীরে প্রবেশ করে জীবাণু বেশিদিন বাঁচ্‌তে পারে না। কাজেই কোন অনিষ্টও কর্‌তে পারে না। আর একটা জিনিষ পাস্তুর আবিষ্কার করেন—সে হচ্ছে যে, 'উত্তাপ জীবাণুদের সহ্য হয় না।' তীব্র গরমে সেগুলো মরে যায়।

এই সময় ফরাসী দেশে গুটীপোকার মহামারী সুরু হয়। কাজেই সে দেশের রেশমের ব্যবসায় ধ্বংস হয়ে যাবার উপক্রম হয়। পাস্তুর সেই মহামারী নিবারণ করে, রেশম ব্যবসায়ীদের ক্ষতি বন্ধ কর্‌বার জন্য, গবেষণা আরম্ভ করে বুঝতে পার্‌লেন যে, তা'-ও ঐ জীবাণুদেরই কাজ। ওই জীবাণুদের ধ্বংস কর্‌তে পার্‌লেই মহামারী বন্ধ হবে। সুতরাং ওর ওষুধ বা'র কর্‌তে আর বেশি সময়ের প্রয়োজন হলো না।

তারপর হলো আর এক ব্যাপার। ফরাসী দেশে পশমী কাপড় বুন্‌বার ব্যবসায় আছে। সে জন্য এক একজন লোক বহু মেষ পুষে থাকে। ওই সময় এক রকম ব্যারাম হয়ে ঐ সব মেষ মরে যেতে লাগ্‌লো। এতে দেশের ভারী ক্ষতি হতে আরম্ভ হলো। আবার ডাক পড়লো পাস্তুরের। এই রোগের নাম হলো এন্‌থ্‌রাক্‌স্‌। পাস্তুর এন্‌থ্‌বাক্‌স্‌ রোগে আক্রান্ত ভেড়ার দেহ থেকে জীবাণু সংগ্রহ করে তাই দিয়ে এক রকম ওষুধ তৈরী কর্‌লেন। যে সমস্ত ভেড়া ঐ রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা, তা'দের দেহে ঐ ওষুধ তিনি প্রয়োগ কর্‌তে লাগ্‌লেন। তা'তে খুব ভাল ফল হলো। সহজে আর কোন ভেড়া ঐ রোগে আক্রান্ত হলো না।

তারপর তাঁ'র একটী মেয়ে টাইফয়েড্‌ রোগে মারা যায়। এই মৃত্যুর দৃশ্য তাঁ'র মনের ওপর এমন একটা ছাপ রেখে গেলো যে, সেই থেকে তিনি তাঁ'র জীবন—শুধু ছোঁয়াচে রোগের ওষুধ আবিষ্কারের কাজেই সমর্পণ কর্‌লেন। ক্রমে তিনি কয়েক রকম ছোঁয়াচে ব্যারামের ওষুধ বা'র করেন। ইরিসিপ্লাস্‌, নালী ঘা, রক্ত-বিষাক্ত প্রভৃতি ব্যারামে পূর্ব্বে যে, কত শত-সহস্র লোক মারা যেতো তার ইয়ত্তা ছিলো না। পাস্তুরের আবিষ্কারের ফলেই

আজকাল এ সব ভীষণ ব্যাধিতে কোন লোক আর বিনা চিকিৎসায় মারা যায় না।

তারপর তাঁর বিশ্ববিখ্যাত আবিষ্কার জলাতঙ্ক রোগের চিকিৎসা। এই চিকিৎসা আবিষ্কারের জন্যই পাস্তুরের নাম মানুষ চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। বাল্যকালে পাস্তুর একটি ছোট ছেলেকে পাগলা শেয়ালে কামড়াতে দেখেছিলেন। সেই থেকেই ঐ ব্যাপারটা তাঁ'র মনে মুদ্রিত হয়ে ছিলো। সেই ছেলেটির পরে জলাতঙ্ক রোগে মৃত্যু হয়। জীবাণু নিয়ে নাড়াচাড়া করবার ফলে পাস্তুর বুঝ্‌তে পারলেন যে, পাগ্‌লা কুকুর বা শেয়াল প্রভৃতি প্রাণীর মুখ থেকে যে ফেনা ঝর্‌তে থাকে, তারই সঙ্গে এমন একটা বিষ আছে যা' মানুষের শরীরে প্রবেশ করে ঐ রোগের সৃষ্টি করে থাকে। তখন তিনি এই ব্যাপারটা নিয়ে পরীক্ষা কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন। এ ব্যাপারের পরীক্ষার জন্য একটা পাগ্‌লা কুকুর প্রয়োজন হলো। পাগ্‌লা কুকুর কেউ এনে দিতে স্বীকার করলো না। তখন পাস্তুর নিজেই পাগ্‌লা কুকুর সংগ্রহের চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লেন এবং অল্পদিনের ভেতরেই একটা সংগ্রহ কর্‌তেও সমর্থ হ'লেন। তারপর সেটাকে নিয়ে তাঁ'র পরীক্ষা চল্‌লো। তিনি তন্ন তন্ন করে তা'র সব আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করে যেতে লাগ্‌লেন। কুকুরটা শেকল দিয়ে

দূরে বাঁধা থাক্‌তো, তিনি দিন-রাত বসে বসে শুধু লক্ষ্য কর্‌তেন, সেটা কি করে না করে, কি কি লক্ষণ তা'র দেহে প্রকাশ পায় ইত্যাদি। পরে ঐ কুকুরটাকে মেরে তা'র মস্তিষ্ক তিনি একটা সুস্থ কুকুরের শরীরে ইন্‌জেক্ট করে ঢুকিয়ে দিলেন। ফলে এই হলো যে, পাগলা কুকুরে কামড়ান সত্ত্বেও ওর শরীরে কোন ব্যারামের লক্ষণ প্রকাশ পেলো না। তখনই তিনি বুঝ্‌তে পার্‌লেন যে, এই ওষুধেই ঐ ব্যারাম সেরে যেতে পারে। এমন সময় একটী বালক পাগ্‌লা কুকুরের কামড় খেয়ে তাঁ'র কাছে চিকিৎসার জন্য আসে। ঐ প্রণালীতে চিকিৎসা করে তিনি তা'কেও আরোগ্য করেন। এই বালকটীর নাম জোসেফ মাইষ্টার—বাড়ী আল্‌সাস্‌ প্রদেশে। এর পরের একটা ঘটনা পূর্ব্বেই বলেছি।

এই সমস্ত আবিষ্কার করে পাস্তুর পৃথিবীর যে কত উপকার করে গেছেন তা' আর কি বল্‌ব? পাস্তুর যে সমস্ত ব্যাধির চিকিৎসা আবিষ্কার করেছেন—পূর্ব্বে যে কত লোক ঐ সব ব্যারামে মারা যেতো, তা' বলে শেষ করা যায় না। যাঁ'রা এই সব আবিষ্কারের জন্য জীবনব্যাপী পরিশ্রম করেন—তাঁ'রা কি সত্যি সত্যিই মানুষের শ্রেষ্ঠ বন্ধু ন'ন?

আলোর ভেল্কী

ব্যারিষ্টার রজত বোসের ছেলে পীণ্টু বোস্‌কে তোমরা অনেকেই হয়ত চেনো। অমন ডানপিটে আর দু'টী হয় না—একেবারে তোমরা যাকে বল Number One অর্থাৎ এক নম্বর। এই পীণ্টু বোসেরই একটা কাহিনী আজ্‌কে তোমাদের বল্‌বো।

এন্যুয়েল পরীক্ষা ও ক্লাস প্রমোশন দুই-ই শেষ হ'য়ে স্কুল বড়দিনেব ছুটি হ'য়ে গেছে। ব্যস্‌ আর কি—একেবারে অফুরন্ত অবসর। উত্তুরে হাওয়া বেশ্‌ জোরে বইতে সুরু করেছে—সুতরাং ঘুড়ি ওড়াবার এমন লোভনীয় সময় আর পাওয়া যাবে না। দুপুরে বাড়ীর সবাই ঘুমিয়ে গেলে, পীণ্টু চুপি চুপি তার ঘুড়ি আর নাটাই নিয়ে একেবারে উঠ্‌লো গিয়ে তেতলার ছাদে। উত্তুরে হাওয়ায় ঘুড়ি ছাড়্‌তেই সাঁ সাঁ ক'রে সেখানা উঠে গেলো আকাশে। পীণ্টুর ঘুড়িখানাকে অমন সহজভাবে উড়্‌তে দেখে বিপরীত দিকের একটা ছাদ থেকে ঘোষেদের কানাই পীণ্টুর ঘুড়িখানাকে কেটে দেওয়ার জন্য যেন একেবারে মরীয়া হ'য়ে উঠে, নাটাই থেকে সূতো ছাড়্‌তে লাগ্‌লো। এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণের জন্য পীণ্টু মোটেই প্রস্তুত ছিলো না। এম্‌নিভাবে হঠাৎ ঘুড়িখানাকে কেটে ফেল্‌লে মস্ত বড় অপমান! সুতরাং

সে আর কোন দিকে না তাকিয়ে, তার ঘুড়িখানাকে যেন না কেটে দিতে পারে, এজন্য সেটাকে সরিয়ে নেবার জন্য, সূতো টান্‌তে টান্‌তে ছুটে ছাদের অপর কোণের দিকে পিছিয়ে যেতে লাগ্‌লো। ছাদের সেদিককার প্যারাপেট্‌টা যে ছোট ছিলো সে-কথা তার একেবারেই খেয়াল ছিলো না— এন্‌নি মত্ত সে হ'য়ে পড়েছিলো। ঐদিকে ছুটে যেতেই— ব্যস্‌ আর কি—প্যারাপেটের গায়ে হোঁচট খেয়ে পীণ্টুরাম একেবারে "পপাত ধরণীতলে"।

পীণ্টুর মত জোয়ান ছেলে ব'লেই রক্ষা—অপর কেউ হ'লে হয়ত একেবারে ফুটবলের মত গোলাকার হ'য়ে যেতো। মাটিতে প'ড়েই ত পীণ্টু ভীষণ চীৎকার! তার চীৎকার শুনে সবাই সেখানে ছুটে এলো। ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে কেউ বল্‌লে হাত, কেউ বল্‌লে পা, আবার কেউ বল্‌লে যে— তেতলার ছাদ থেকে যখন পড়েছে তখন ও দু'টোই না ভেঙ্গে যায় না। পীণ্টুর মামা কেষ্টবাবু বিবেচক লোক, তিনি বল্‌লেন—"হাতই ভাঙ্গুক আর পা-ই ভাঙ্গুক বা আর কিছুই হ'য়ে থা'ক—সে নিয়ে গবেষণা ক'রে কোন লাভ নেই। কাছেই ত হাসপাতাল রয়েছে—সেখানে নিয়ে গেলেই ব্যাপার সব বোঝা যাবে।" ঘরের মোটরে তাকে নিয়ে কেষ্টবাবু হাসপাতালে ছুট্‌লেন।

হাসপাতালের ডাক্তার ভাল ক'রে হাত পা টিপে টিপে পরীক্ষা ক'রে দেখে বল্‌লেন—"এক্স্‌-রে (X-Ray) দিয়ে পরীক্ষা না কর্‌লে সঠিকভাবে বোঝা যাবে না কি হয়েছে।" ডাক্তার X-Ray পরীক্ষার ঘরে পীণ্টুকে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা ক'রে বল্‌লেন—"ভয়ের কোন কারণ নেই, পায়ের একখানা ছোট হাড় মাত্র স'রে গেছে—সেটা ঠিকভাবে বসিয়ে ব্যাণ্ডেজ ক'রে দিচ্ছি—এতেই সেরে যাবে। তবে বিছানায় কয়েকদিন শুয়ে থাক্‌তে হবে।" এ যাত্রায় ডান্‌পিটে পীণ্টু অল্পেতেই রক্ষা পেয়ে গেলো।

ঘটনাটা শুনে তোমরা হয়ত অবাক্ হ'য়ে ভাব্‌ছ—এ কি ক'রে সম্ভব হলো—একটা যন্ত্রের সাহায্যে—পায়ের ভেতরের হাড় যে ভেঙ্গে গেছে তা চাম্‌ড়া মাংস ইত্যাদি না কেটেও ডাক্তার কি করে বুঝ্‌তে পার্‌লেন। সত্যি এতে অবাক্ হবার মত অনেক কিছুই আছে। X-Ray যন্ত্রটা ভারী আশ্চর্য্য জিনিস। এই যন্ত্রের ভেতর থেকে এম্‌নি তীব্র একরকম আলো বের হয় যে, সেই আলো হাড় এবং লোহা প্রভৃতি ধাতব পদার্থ ছাড়া—আর যে কোন প্রকার অস্বচ্ছ পদার্থই ভেদ ক'রে যেতে পারে।

এই এক্স্‌-রে যিনি আবিষ্কার করেন তাঁর নাম আচার্য্য উইলিয়ম কোনরেড্ ফন্ রন্‌জেন্। আবিষ্কর্ত্তার নাম

অনুসারে এই আলোকে রন্‌জেন্ আলোও বলা হয়। জার্ম্মাণীর অন্তর্গত প্রাশিয়া প্রদেশের লেনেপ শহরে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে এঁর জন্ম হয়।

রন্‌জেন্ আলো বা একৃস্-রে নামটী তোমাদের অনেকেরই হয় ত অজানা নয়। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত রন্‌জেন্ আলো দেখেও থাক্‌বে। আজকাল অনেক সহরের হাসপাতালেই এ যন্ত্রের সাহায্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। মানুষের শরীরের চাম্‌ড়া বা তার নীচে যে মাংস আছে সবইত অস্বচ্ছ পদার্থ; কাজে কাজেই মানুষের দৃষ্টি এগুলো ভেদ ক'রে যেতে পারে না, সুতরাং মানুষের শরীরের ভেতরের কোন যন্ত্র যদি রোগাক্রান্ত হ'য়ে বিকল হ'য়ে পড়ে—তখনই হয় সব চেয়ে মুস্কিল। সেই সময়েই এই যন্ত্রটীর সাহায্য না হ'লে আর চলে না। কাজেই রোগ চিকিৎসার ব্যাপারে এই যন্ত্রটীর প্রয়োজন খুবই বেশী। এই যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্ব্বে শরীরের চাম্‌ড়া, মাংস ইত্যাদি কেটে নিয়ে অথবা অনুমানের ওপর নির্ভর ক'রে চিকিৎসকদের কাজ সার্‌তে হতো—এখন আর তা হয় না। এই আলোর সাহায্যেই পরীক্ষা ক'রে বুঝ্‌তে পারা যায় ভেতরে কি হয়েছে।

রন্‌জেন্ আলোর সম্বন্ধে জান্‌বার সঙ্গে সঙ্গে তার আবিষ্কর্ত্তার জীবন-কথাও কিছু কিছু তোমাদের জেনে

নিতে হ'বে। তাঁর দেশ জার্ম্মাণীতে হ'লেও তিনি প্রাথমিক্ শিক্ষা লাভ করেছিলেন হল্যাণ্ডে। হল্যাণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ ক'রে, তিনি উচ্চশিক্ষা-লাভের জন্য সুইজারল্যাণ্ডের জুরিচ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। বিজ্ঞানের সর্ব্বশেষ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হ'য়ে, তিনি সেখান থেকে 'ডক্টর অব্ সায়েন্স' উপাধি লাভ করেন। এর পর তিনি জার্ম্মাণীর কয়েকটী বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপকের কাজ করেন। কয়েক বৎসর এইভাবে সহকারী অধ্যাপকের কাজ ক'রে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কর্‌বার পর, তিনি উরজ্‌বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধান অধ্যাপকের পদ পেলেন। সেইখানেই রন্‌জেনের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হলো।

ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারটী ছিলো যেম্‌নি বড় তেমনি সেখানে নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাঁতিও ছিল প্রচুর। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান ক'রেই বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বিশেষভাবে মনোনিবেশ কর্‌লেন। বাল্যকাল থেকেই রন্‌জেন্ খুব ভালো ফটোগ্রাফ তুল্‌তে পার্‌তেন। ফুঁকো কাঁচের নল, বোতল ইত্যাদি তৈরী কর্‌বার অভিজ্ঞতাও তিনি অল্প বয়সেই লাভ করেছিলেন। এই অভিজ্ঞতা তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণায় খুব বেশী কাজে এসেছিলো। এ অভিজ্ঞতা বাল্যে সঞ্চয় না কর্‌লে হয়ত

পরবর্ত্তী জীবনে রন্‌জেন্‌ বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ব'লে পরিচিত হ'তে পারতেন না। তা' হ'লে হয়ত শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পড়িয়েই তাঁর অন্যান্য সাধারণ অধ্যাপকের মত জীবন অতিবাহিত করতে হতো।

রন্‌জেনের আবিষ্কার সম্বন্ধে ভাল ক'রে বুঝতে হ'লে গোড়ার কথা কিছু জেনে নেওয়া প্রয়োজন। বিদ্যুৎ কা'কে বলে তা হয়ত তোমরা অনেকেই জানো। বিদ্যুৎ জিনিষটী নিয়ে বৈজ্ঞানিকদের ভেতর বহুকাল ধ'রেই নানারকম গবেষণা চল্‌ছিলো। কোন কোন বৈজ্ঞানিক বল্‌লেন যে—বিদ্যুতের গতি বাতাসে বাধা পায়। কথাটা সত্য কিনা, পরীক্ষা কর্‌বার জন্য প্লুকার নামে একজন বৈজ্ঞানিক একটা কাচের পাত্রকে কৌশলে বায়ুহীন অর্থাৎ তার ভেতর থেকে সমস্ত বাতাস বার ক'রে নিয়ে—সেই শূন্য পাত্রের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ কর্‌লেন। ফলে ব্যাপার দাঁড়াল ভারী অদ্ভুত। দেখা গেলো যে, পাত্রের এক মুখ থেকে এক প্রকার অদ্ভুত তেজসম্পন্ন সবুজ, নীল, হল্‌দে প্রভৃতি নানাবর্ণের আলো বা'র হ'য়ে পাত্রের অপর মুখে গিয়ে পড়্‌ছে। বায়ুহীন কাচ-পাত্রের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চালাবার ফলে যে নূতন একটী আশ্চর্য্য আলোর সৃষ্টি হলো সেটা কি সত্যি সত্যিই আলো না অপর কিছু! সত্যিই

স্যার উইলিয়ম্ ক্রুকস্

ডঃ চার্লস রন্টজেন্

এটা আলো নয়—এ এক প্রকার রশ্মি। এ নূতন আবিষ্কৃত রশ্মির নাম দেওয়া হলো ক্যাথোড্ রশ্মি। স্যার উইলিয়ম ক্রুক্শ্ নামে একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বল্লেন—এই যে ক্যাথোড্ রশ্মি—এ আর কিছুই নয়—বিদ্যুৎক্ষরণের ফলে এর সৃষ্টি এবং এ রশ্মিও বিদ্যুতেরই অণু পরমাণু।

স্যার উইলিয়ম ক্রুক্শ্ তাঁর এই নূতন আবিষ্কার সম্বন্ধে সাময়িক পত্রিকায় এক প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। তাঁর প্রবন্ধ পাঠ ক'রে বৈজ্ঞানিক মহলে খুব সাড়া প'ড়ে গেলো। বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা এ বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করলেন।

উইলিয়ম ক্রুক্সের প্রবন্ধ পাঠ ক'রে রন্জেনের মনেও ভারী একটা কৌতূহলের সৃষ্টি হলো। তিনিও এ বিষয়ে গবেষণা কর্তে মনস্থ কর্লেন। তাঁর গবেষণাগারের নিভৃত কোণে বসে যন্ত্রপাঁতি নিয়ে তিনি পরীক্ষা আরম্ভ কর্লেন। ফুঁকো কাচের পাত্র তৈরীর অভিজ্ঞতা তাঁর এ সময় ভারী কাজে এলো। পরীক্ষার জন্য বায়ুশূন্য কাচের পাত্র তিনি নিজেই তৈরী কর্তে সমর্থ হ'লেন। দিনের পর দিন তিনি পরীক্ষা ক'রে কাটিয়ে দিতে লাগ্লেন।

একদা রন্জেন্ তাঁর গবেষণাগারের নিভৃত কোণে ব'সে একটা বায়ুশূন্য কাচের নলের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালিয়ে পরীক্ষা কর্ছেন। কাচের নলটা একটা কার্ডবোর্ডের

বাক্সের মধ্যে বন্ধ ছিলো। সেখানে টেবিলের ওপরে বেরিয়াম প্লেটিনোসায়োনেড্-মাখানো একটা প্লেট পড়েছিলো। বেরিয়াম প্লেটিনোসাঁয়োনেড্ জিনিষটী ভারী আশ্চর্য্য রকমের। কোন তেজের সাম্‌নে খানিকক্ষণ এ জিনিষটাকে রাখ্‌লে পর, সে ঐ তেজ নিজের ভেতরে গ্রহণ করে নেয়, এবং নিজেই আলো দিতে আরম্ভ করে। বিদ্যুৎ যখন বায়ুশূন্য কাচের পাত্রের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল—তখন রন্‌জেন্ হঠাৎ লক্ষ্য করলেন যে, বেরিয়াম প্লেটিনোসায়োনেড্-মাখানো প্লেটটার ওপরে সবুজ আলোর একটা ক্ষীণ রেখা দেখা যাচ্ছে। প্রথম তিনি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পার্‌লেন না। তিনি মনে মনে ভাব্‌লেন যে, হয়ত বা কার্ডবোর্ডের বাক্সটার কোথাও ছিদ্র আছে—সেই ছিদ্রপথে আলোক বেরিয়ে আস্‌ছে, আর বেরিয়াম প্লেটিনোসায়োনেড্ সেই তেজ গ্রহণ ক'রে আলো দিচ্ছে। তিান কার্ডবোর্ডের বাক্সটার চা'রদিকে অনুসন্ধান ক'রে দেখ্‌লেন কোথাও ছিদ্র নেই। অবাক্ হ'য়ে তিনি ভাব্‌লেন ব্যাপার ত তা হ'লে অন্য রকম। নূতন একটা আবিষ্কারের আশায় তিনি উল্লসিত হ'য়ে উঠ্‌লেন।

রন্‌জেন্ প্রতিভা ও মনীষার অধিকারী যদি না হতেন তা' হ'লে এই সবুজ ক্ষীণ আলোর রেখা সম্বন্ধে তাঁর কোন কিছুই

মনে হতো না। এইভাবেই একদা হঠাৎ "রন্‌জেন্ আলো" আবিষ্কারের সূচনা হয়। এই ঘটনা ঘটে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই নবেম্বর।

রন্‌জেন্ একটা নূতন আবিষ্কারের সন্ধান পেলেন বটে, কিন্তু তিনি একথা কারও কাছে প্রকাশ না ক'রে, এ নিয়ে গবেষণা করতে সুরু করলেন। পূর্ব্বে তিনি আর যে সব গবেষণা সুরু করেছিলেন, সে সমস্তই ছেড়ে দিয়ে, শুধু আলোর এই রহস্যপূর্ণ নূতন রূপের সন্ধান নিতে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন। তিনি পরীক্ষার পর পরীক্ষা ক'রে বুঝতে পারলেন—এ নূতন আলোর শক্তি অতি অদ্ভুত। এ আলো শুধু পাতলা কার্ডবোর্ডই ভেদ ক'রে যায় না—কাঠ, কাপড় এমন কি দু'হাজার পৃষ্ঠার একখানা মোটা বই পর্য্যন্ত ভেদ করে চলে যায়। একদিন কি মনে করে তিনি একটা বায়ুশূন্য কাচ-পাত্রের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিয়ে দিয়ে, অল্প একটু দূরে প্লেটিনোসায়োনেড্-মাখানো একটা প্লেট ধরলেন; তারপর দু'য়ের মাঝখানে রাখলেন তাঁর হাতের পাতাটা। এরপর যে ব্যাপার তিনি দেখতে পেলেন তাতে আনন্দে তিনি একেবারে লাফিয়ে উঠলেন। তিনি দেখতে পেলেন তাঁর হাতের পাতার সবগুলো হাড়ই ওই প্লেটটার ওপরে খুবই সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হ'য়েছে। ঐ দিন বিজ্ঞানের

ইতিহাসে একটা শুভদিন। ঐ দিন বিজ্ঞান-জগতে একটা বিরাট নূতন আবিষ্কারের সূচনা হলো।

আরও মাস কয়েক গবেষণা কর্‌বার পর রন্‌জেন্‌ এ সম্বন্ধে আরও একটা অদ্ভুত আবিষ্কার কর্‌তে সমর্থ হ'লেন। বিজ্ঞান-জগতে সে আবিষ্কারের স্থানও বহু উচ্চে। তাঁর গবেষণাগারের টেবিলের ওপর একখানা বই প'ড়েছিলো। সেই বইখানার নীচে ছিলো ফটোগ্রাফ তুল্‌বার একটা প্লেট্‌। রন্‌জেনের একটা অভ্যাস ছিলো, বইয়ের যে অংশটুকু পড়া হ'য়ে গেছে সেটুকু চিহ্নিত ক'রে রাখ্‌বার জন্য বইয়ের মধ্যে একটা চাবী রেখে দেওয়া। তাঁর অভ্যাসমত ঐ বইখানার ভেতরেও তিনি একটা চাবী রেখেছিলেন। যখন তিনি এই নূতন আলো নিয়ে পরীক্ষায় ব্যস্ত, তখনও চাবীশুদ্ধ ঐ বইখানা ফটোগ্রাফের প্লেটটার ওপরেই ছিলো। রন্‌জেনের ঐদিকে আর কোন লক্ষ্যই ছিলো না। একদিন ফটো তোল্‌বার জন্য তিনি বইয়ের নীচ থেকে প্লেট্‌খানা বা'র ক'রে নিয়ে ফটো তুল্‌লেন। ফটোটা কাগজে মুদ্রিত করবার পর দেখা গেল যে, ছবির ওপরে একটা কালো অস্পষ্ট দাগ দেখা যাচ্ছে। প্রথমে ব্যাপারটা তিনি ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌লেন না,—তারপর কিছুক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা ক'রে ব্যাপারটা অনেকটা বুঝে নিলেন। ঐ ব্যাপার

বুঝ্‌তে পেরে তিনি ভারী আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন। খুব ভালো ক'রে লক্ষ্য ক'রে তিনি বুঝেছিলেন। ফটোগ্রাফের ওপরকার এই অস্পষ্ট কালো দাগ একটা চাবীর ফটো ছাড়া আর কিছুই নয়। তখন ব্যাপারটা তাঁর কাছে একেবারে পরিষ্কার হ'য়ে গেলো। এই ভাবেই হঠাৎ পৃথিবীর অনেক বড় বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সূচনা হয়েছে।

তিনি আবার এবিষয়ে পরীক্ষা কর্‌বার জন্য মোটা বইটার মাঝে একটা চাবী রাখ্‌লেন এবং তার নীচে একটা ফটোগ্রাফের প্লেট রেখে, বায়ুশূন্য কাচ-পাত্রের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চালিয়ে দিলেন। ঠিক পূর্ব্বের মতই হ'ল—চাবীর ফটো প্লেটটার ওপরে উঠে গেলো।

এই পরীক্ষার পর তিনি তাঁর আবিষ্কারের গুরুত্ব বিশেষভাবে বুঝ্‌তে পার্‌লেন। তিনি বুঝ্‌তে পার্‌লেন, যে আলো তিনি আবিষ্কার করেছেন সে অতি অদ্ভুত। সাধারণ প্রদীপ, গ্যাস বা বিদ্যুতের আলোর মত এ আলো মানুষে চোখে দেখ্‌তে পায় না। কেবল মাত্র বেরিয়াম প্লেটিনোসায়োনেড্‌ মাখানো কোন প্লেটের ওপরে এর শক্তি যখন প্রতিফলিত হয় তখনই একে দেখা যায়। এ আলোর এম্‌নি শক্তি যে, অস্বচ্ছ পদার্থ পর্য্যন্ত ভেদ ক'রে চ'লে যেতে পারে—কোন বাধাই মানে না। শুধু হাড় এবং

লোহা প্রভৃতি ধাতব পদার্থে এ আলো বাধা পায়। অস্বচ্ছ পদার্থের অভ্যন্তরে যে সব জিনিস আছে তার ফটোগ্রাফ পর্য্যন্ত ইচ্ছা করলে এ আলোর সাহায্যে তুলে নেওয়া যায়।

রন্‌জেন্ এই অভাবনীয় আবিষ্কার ক'রে বিজ্ঞানের গবেষণার একটা নূতন পথ খুলে দিলেন। চিকিৎসকদের কাছেই এই আশ্চর্য্য আবিষ্কার সব চেয়ে বেশী লাভের হলো। এরপর আরও দু'বৎসরকাল কঠোর পরিশ্রম ক'রে রন্‌জেন্ তাঁর এই আবিষ্কারকে নিখুঁত অবস্থায় আন্‌লেন। তিনি তাঁর এই নব আবিষ্কৃত আলোকের নাম দিলেন "এক্‌স্-রে" (X-Ray). বিজ্ঞানের ভাষায় এক্‌স্ (X)-এর অর্থ অনির্দ্দিষ্ট। আবিষ্কৃত আলোর স্বরূপ পূরোপূরি-ভাবে ঠিক্ করতে না পেরে তিনি এর এরূপ নামকরণ করলেন। রন্‌জেনের এই আবিষ্কারের কথা যখন প্রকাশ হলো তখন সমগ্র জগৎ বিস্ময়ে একেবারে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলো!

রন্‌জেন্ এই আলো আবিষ্কার ক'রে চিকিৎসা জগতে যে বিপ্লবের সৃষ্টি ক'রেছেন তা সত্যি সত্যিই অতুলনীয়। এই আলো আবিষ্কারের পূর্ব্বে মানুষের শরীরের ভেতরের কোন যন্ত্র যদি বিকল হ'য়ে যেতো, তবে তার চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকদের অত্যন্ত অসুবিধায় পড়তে হতো। অনেক

সময় শুধু অনুমানের ওপর নির্ভর ক'রেই চিকিৎসা করতে হতো। ধর, কারও বুকের পাঁজরের একখানা হাড় ভেঙ্গে গেলো ; সে হাড়টা কতটুকু ভেঙ্গেছে, কি অবস্থায় কি রকম ভাবে আছে তা বাইরে থেকে বোঝবার একেবারেই উপায় নেই। কিন্তু রনজেনের আবিষ্কৃত আলোর সাহায্যে তা বোঝা সম্ভবপর। ইচ্ছা করলে ঐ ভাঙ্গা হাড়ের একখানা ফটোগ্রাফ পর্য্যন্ত তুলে নেওয়া যায়। শুধু হাড় ভাঙ্গাই নয়, আরও অনেক কঠিন কঠিন ব্যাধির চিকিৎসায়ও এই রনজেনের আবিষ্কৃত রশ্মির সাহায্য প্রয়োজন হয়ে থাকে। যক্ষ্মা রোগে ফুস্ফুস্ আক্রান্ত হয়ে, সেখানে ঘা হয়। যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসার সময় ডাক্তারদের ফুস্ফুসের ঐ ঘাগুলো পরীক্ষা করবার প্রয়োজন হয় ; কিন্তু বাইরে থেকে তা করা সম্ভবপর নয়। তাই বাধ্য হয়ে রনজেন্ রশ্মির সাহায্যে ফুস্ফুসের একটা ফটোগ্রাফ তুলে নিয়ে তারা কাজ চালিয়ে থাকেন। পাকস্থলী, লিভার প্রভৃতি দেহের অভ্যন্তরস্থ অন্যান্য যন্ত্র যদি বিকল হয়ে পড়ে তা' হ'লে চিকিৎসার জন্য তারও ফটো নেওয়া অনেক সময় দরকার হয়। রনজেন রশ্মি আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে আজকাল বাইরে থেকেই ফটো তুলে সব ব্যাপার স্পষ্টভাবে দেখে নিয়ে, ভাল ক'রে বুঝে, সেই অনুযায়ী

ঐসব রোগের চিকিৎসা ক'রে, রোগীকে নিরাময় কর্তে চিকিৎসকদের আর তেমন কিছু অসুবিধা হয় না।

এই আশ্চর্য্য আবিষ্কারের জন্য ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

রন্‌জেনের এই আবিষ্কার হ'য়েছিল ব'লেই পীণ্টু বোসের চিকিৎসাও এত সহজ হ'য়েছিল।

আলোক চিকিৎসা

মাত্র চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও কেউ কল্পনা করতে পারে নি যে, শুধু মাত্র আলোর সাহায্যে কোন শক্ত ব্যাধি সারিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

ডেনমার্কের কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীর-বিদ্যার অধ্যাপক নিয়েল ফিনসেনই সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করেন, যে, শুধু আলোর সাহায্যে নানাপ্রকার মারাত্মক ব্যাধি আরোগ্য করা যেতে পারে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর ফেরো দ্বীপে এই অধ্যাপকের জন্ম হয়। কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শেষ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হ'য়ে সেখানেই তিনি অধ্যাপকের পদ লাভ করেন।

তিনি বাল্যকালে, আইসল্যাণ্ডের রিক্জাভিকে বাস করতেন। সেখানে বৎসরের খুব অল্প সময়ই সূর্য্যের আলোক পাওয়া যায়। তথায় থাকবার সময়ই আলোক ও অন্ধকারের বৈষম্য তিনি বুঝতে পারেন। তারই ফলে, আলোক সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানবার জন্য তাঁর মন কৌতূহলী হ'য়ে ওঠে। ওখান থেকে উচ্চশিক্ষালাভের জন্য তিনি যখন কোপেনহেগেনে এলেন তখন বুঝতে পারলেন যে, আলো সকল সময়ই মানুষের দেহের শুধু উপকারই করে না—

অপকারও ক'রে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা শেষ হ'লে, তিনি ঐ বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে আরম্ভ করলেন।

এ সম্বন্ধে সমস্ত কথা পরিষ্কারভাবে বুঝতে হ'লে, আলোক জিনিসটা কি, তা' খুবই ভাল ক'রে জেনে নিতে হবে। আলোক দেখে আমরা মনে করি যে, আলোকের বর্ণ খুব উজ্জ্বল সাদা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আলোকের রং সাদা নয়; ওতে সাতটী বিভিন্ন বর্ণের রশ্মির সমাবেশ আছে। রশ্মিগুলো সাধারণতঃ খালি চোখে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দেখা যায় না। ত্রি-কোণ বিশিষ্ট কাচের টুকরা (Prism) সূর্য্যের আলোকে ধরলে, দেখতে পাওয়া যায়—সাতটী বিভিন্ন বর্ণের রশ্মিতে আলোক বিভক্ত হ'য়ে গেছে। সেই সাতটী রশ্মির রং মূল রং। রামধনুর গায়েও সেই সাতটী মূল রংই দেখা যায়।

সূর্য্যের আলোকে যে সাতটী বিভিন্ন বর্ণের রশ্মি আছে তা নিউটন আবিষ্কার করেন। একথা পূর্ব্বে নিউটনের গল্পে তোমাদের বলেছি। ঐ সমস্ত রশ্মির মধ্যে নীল, বেগুনে প্রভৃতি রশ্মির রাসায়নিক ক্রিয়ার শক্তি আছে। ঐ সমস্ত রশ্মি, দেহে নানাপ্রকার রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সাধন করতে পারে। আলোকের মধ্যে যে রশ্মি রয়েছে, সেগুলো শরীরের ওপর প'ড়ে শরীরকে আঘাত করে, আর তারই ফলে শরীরের উপকার বা অপকার হয়।

বৈজ্ঞানিকেরা আলোর সম্বন্ধে আরও অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা বলেন—সূর্য্যের আলোতে শুধু সাতটী বর্ণের রশ্মিই নেই, তা' ছাড়া আরও অনেক রশ্মি আছে। সেগুলো চোখে দেখা যায় না। তাঁরা বলেন —আমাদের এই যে পৃথিবী, এর সমস্তটাই 'ইথার' নামে একপ্রকার জিনিষ দিয়ে পরিপূর্ণ। এর কোথাও ফাঁকা নেই। তোমরা একটা মাঠের মধ্যে দাড়িয়ে হয়ত মনে করছো—ওটা ফাঁকা ; উর্দ্ধে আকাশের দিকে তাকিয়ে হয়ত ভাবছো—সবটাই শূন্য ; কিন্তু তা নয়—সর্ব্বত্রই ঐ ইথার রয়েছে। খেলবার সময় পুকুরের জলে কখনও যদি ঢিল ছুঁড়ে থাক, তবে নিশ্চয়ই দেখেছ ঢিল ছুঁড়বামাত্রই সেখানে ছোট ছোট ঢেউ উঠেছে। আলোক জিনিসটীও ইথারের ঐ প্রকার ঢেউ। ইথারের মধ্যে যদি কোন রকমে ঢেউ তোলা যায়, তবেই আলোকের জন্ম হয়। ইথারের ছোট বড় নানাপ্রকার ঢেউয়ে নানা কাণ্ডের সৃষ্টি হয়। আলো, তাপ, একস্-রে অতি-বেগুনীয়া অদৃশ্য-রশ্মি প্রভৃতি সমস্তই ইথারের ঢেউ থেকে জন্মে থাকে। ইথারের খুব ছোট ছোট ঢেউ থেকে জন্মে একস্-রে। তা'র সাহায্যে আজকাল ডাক্তারেরা শরীরের মধ্যে কোথায় কোন্ যন্ত্র বিকল হয়েছে, তা জেনে নিচ্ছেন। তার চেয়ে যেগুলো

বড় ঢেউ সেগুলো থেকে জন্মে অতি-বেগুনীয়া অদৃশ্য-রশ্মি (Ultra-Violet Ray)। সেই অদৃশ্য-আলোক চোখে দেখা যায় না। শুধু ফটোগ্রাফের প্লেটের ওপর পড়লে তা'র অস্তিত্ব ধরা পড়ে। যে ঢেউ থেকে অতি-বেগুনীয়া অদৃশ্য-আলোক জন্মে—তার চেয়ে যেগুলো বড় ঢেউ সেগুলো থেকে বেগুনে, নীল, সবুজ প্রভৃতি নানা বর্ণের রশ্মির সৃষ্টি হ'য়ে থাকে। অতি-বেগুনীয়া অদৃশ্য-রশ্মি মানুষের শরীরে সব চেয়ে বেশী রাসায়নিক পরিবর্ত্তন আনতে পারে। শরীরের পুষ্টির পক্ষেও ঐ রশ্মি বিশেষভাবে সাহায্য করতে পারে।

সূর্য্য-কিরণে বিভিন্ন রশ্মি আছে সত্য, কিন্তু সকল সময়ে চিকিৎসার কাজে তা ব্যবহার করা অতি শক্ত। ধর, একদিন সমস্ত আকাশটা মেঘেই ঢেকে রইলো—তখন উপায় কি ? পৃথিবীতে এমন অনেক দেশ আছে, যেখানে বছরের অনেক সময়ই সূর্য্য-কিরণ পাওয়া যায় না ; সে দেশেই বা কি হবে ? তা ছাড়া সূর্য্যের আলোকে এর পরিমাণ এত অল্প যে, সেখান থেকে এ রশ্মি সংগ্রহ করে, সহজে রোগীর ওপর প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। আর সূর্য্যের আলোকে যে রশ্মি পাওয়া যায় তা থেকে কৃত্রিম রশ্মির রোগ উপশম করবার শক্তিও বেশী। এই সব কথা ভেবেই

ফিন্‌সেন সূর্য্যের কৃত্রিম কিরণ ও তা'র বিভিন্ন রশ্মি আবিষ্কারের চেষ্টায় মন দিলেন।

'আশ্চর্য্য আলো'র গল্পে তোমাদের কাছে ক্রুক্‌শের আবিষ্কৃত অদৃশ্য রশ্মির কথা বলেছি। ক্রুক্‌শের আবিষ্কৃত অদৃশ্য রশ্মির সূত্র অবলম্বন ক'রেই ফিন্‌সেন পরীক্ষা আরম্ভ কর্‌লেন। বহু পরীক্ষার পর তিনি কৃত্রিম রশ্মি প্রস্তুত কর্‌তেও সমর্থ হ'লেন। সেই রশ্মি আর সূর্য্যালোকের অতি-বেগুনীয়া অদৃশ্য-রশ্মি এক। ওর ক্ষমতা অতি অদ্ভুত এবং বিশেষ শক্তি-সম্পন্ন। অতি কঠিন ব্যাধির জীবাণুও ঐ রশ্মি অতি সহজেই ধ্বংস করতে পারে।

ফিন্‌সেন যখন এই গবেষণার কাজে ব্যস্ত, তখন কোপেন্‌হেগেনে ভয়ানক বসন্তের প্রাদুর্ভাব হয়। ফিন্‌সেন শুন্‌তে পান যে, আমেরিকার কোন এক হাসপাতালে বিশেষ কারণে বাধ্য হ'য়ে কয়েকজন বসন্ত-রোগীকে অন্ধকারময় এক গৃহে বন্ধ ক'রে রাখা হয়েছিলো, তারা সবাই আরোগ্য লাভ করেছে এবং তাদের কারও শরীরে কোন চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই। ফিন্‌সেন বুঝ্‌তে পার্‌লেন যে, অন্ধকারময় গৃহে থাকার ফলে সূর্য্যের আলোকে যে নীল বর্ণের রশ্মি আছে তা রোগীদের স্পর্শ কর্‌তে পারে নি, তাই তা'রা রক্ষা পেয়ে গেছে।

পুরোণো চিকিৎসা-গ্রন্থ পাঠ ক'রে ফিন্‌সেন জান্‌তে পারেন যে, পুরাকালে চীনদেশে বসন্ত-রোগীদের যে ঘরে রাখা হতো সেই ঘরের দরজা জানালায় লাল পর্দ্দা টাঙিয়ে দেওয়া হতো, মধ্যযুগে ইউরোপে বসন্ত-রোগীদের সমস্ত শরীর লাল কাপড়ে মুড়ে দেওয়া হতো, ফলে তা'রা আরোগ্য লাভ কর্‌তো। ফিন্‌সেন এই ব্যাপার-গুলোকে প্রথম কুসংস্কার ব'লে ভেবেছিলেন। পরে চিন্তা ক'রে স্থির কর্‌লেন—মন্দ কি পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক্ না। তিনি কয়েকজন বসন্ত-রোগীকে নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ কর্‌লেন। রোগীদের ঘরের দরজা জানালায় ভারী ভারী লাল রংয়ের ফ্লানেলের পর্দ্দা এমনভাবে টাঙিয়ে দেওয়া হলো যেন—তা'র ভেতর দিয়ে ছাড়া সূর্য্যালোক কোন ক্রমেই ঘরে প্রবেশ করতে না পারে। তার ফল খুবই ভাল হলো। সমস্ত রোগীই সেরে উঠ্‌লো। এমন কি তাদের শরীরে বসন্তের দাগ পর্য্যন্ত আর রইলো না। পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হ'য়ে তিনি প্রচার ক'রে দিলেন যে, লাল কাচে ঘেরা কোন ঘরের মধ্যে যদি বসন্ত-রোগীদের রাখা যায়, তবে তাদের নীরোগ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই প্রণালীতে বর্ত্তমানে পৃথিবীর অনেক দেশে বসন্তের চিকিৎসা হ'য়ে থাকে।

রেন্টগেন

মাদাম কুরী

লাল কাচ দিয়ে ঘেরা ঘরে বসন্ত-রোগীদের রাখ্‌তে কেন বল্‌লেন তা হয়ত তোমরা সকলে বুঝ্‌তে পারো নি। সূর্য্যালোকের মধ্যে যে নীল বর্ণের রশ্মি আছে—সেটাই বসন্ত-রোগীদের ক্ষতি ঘটিয়ে থাকে। লাল আয়নার মধ্য দিয়ে সূর্য্যকিরণ যদি প্রবেশ করে, তবে লাল ভিন্ন-আলোকের অপর রশ্মিগুলো নষ্ট হ'য়ে যায়।

এই সাফল্যে উৎসাহিত হ'য়ে ফিন্‌সেন তাঁর আবিষ্কৃত অতি-বেগুনীয়া রশ্মি নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ কর্‌লেন। ঐ রশ্মি আবিষ্কারের পর অনেকে মনে করেছিলেন যে, যক্ষ্মা প্রভৃতি জীবাণুঘটিত কঠিন ব্যাধিও ঐ রশ্মির সাহায্যে আরোগ্য করা যাবে। কিন্তু পরীক্ষা ক'রে দেখা গেলো যে, তা সম্ভব নয়। কারণ ঐ রশ্মি প্রচুর পরিমাণে শরীরের ভেতরে প্রবেশ কর্‌তে পারে না। তার কারণ এই যে, ঐ রশ্মি দেহের মধ্যে যে লাল রক্ত আছে তা ভেদ ক'রে শরীরে প্রবেশ কর্‌তে পারে না। যেমন লাল আয়নার মধ্য দিয়ে সূর্য্যের কিরণের অপর রশ্মি প্রবেশ কর্‌তে গিয়ে বিনষ্ট হ'য়ে যায়। সুতরাং শরীরের অভ্যন্তরে যে জীবাণুঘটিত ব্যাধি জন্মে ফিন্‌সেন সেগুলো নিরাময় কর্‌বার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে, শরীরের উপরিভাগের ব্যাধিগুলো নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ কর্‌লেন। তাতে তিনি কৃতকার্য্যও হ'লেন। যক্ষ্মার জীবাণু

যদি শরীরের চামড়াকে আক্রমণ করে, তবে লুপাস নামে এক প্রকার কঠিন রোগ জন্মে। তিনি তাঁর আবিষ্কৃত রশ্মির সাহায্যে লুপাসের মত শক্ত ব্যাধিও আরোগ্য ক'রে দিলেন। এই আশ্চর্য্য আবিষ্কারের জন্য দেশ-বিদেশে তাঁর খ্যাতি রটে গেলো। গলগণ্ড, ঘা, পাঁচড়া, দাদ প্রভৃতি যে কোন চর্ম্মরোগ ঐ আলোকের সাহায্যে সারিয়ে দেওয়া যায়। তা ছাড়া আলোর সাহায্যে আরও বহুপ্রকার চর্ম্মরোগ আরোগ্য কর্‌বার উপায় তিনি আবিষ্কার করেন।

আলোর সাহায্যে ব্যাধি আরোগ্যের নূতন উপায় আবিষ্কারের জন্য ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে কোপেন্‌হেগেনে ফিন্‌সেন একটী গবেষণাগার ও চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। সেখানে নানাপ্রকার দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা ক'রে বহুরোগীকে তিনি আরোগ্য করেন। চিকিৎসায় আলোকের ব্যবহার সম্বন্ধে এই আশ্চর্য্য অভিনব প্রণালী আবিষ্কারের জন্য ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

জীবনের শেষ দিকে তিনি এত অসুস্থ হ'য়ে পড়েন যে, বাড়ী থেকে কোথাও আর বেরুতে পার্‌তেন না। এজন্য তিনি কখনও নিরুৎসাহ হ'ন নাই; অসুস্থ শরীর নিয়েই বিজ্ঞানের সেবায় জীবন কাটিয়েছেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

রেডিয়ম

সন্ধ্যা তখনও শেষ হয় নাই। সুরম্য মহানগরী প্যারিসের পথে পথে সবেমাত্র তখন আলোক-মালার সমারোহ সুরু হয়েছে। ঠিক এম্‌নি কালে সেখানকারই একটা বিরাট সভাগৃহ লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। "ন স্থান তিল ধারণং"—অর্থাৎ তিলটী মাত্র রাখ্‌বার মত যায়গাও আর সেখানে বাকী নেই। দেশ-বিদেশের বহু জ্ঞানী-গুণী এসে উৎসাহভরে আজ সেখানে ভিড় জমিয়েছেন।

......কেন?

কেন—সে কথাই বল্‌ছি। সেখানে আজ একজন বৈজ্ঞানিক তাঁরই আবিষ্কৃত একটা অত্যাশ্চর্য্য পদার্থ সম্বন্ধে বক্তৃতা করবেন। বৈজ্ঞানিক নারী—এজন্যই লোকের কৌতূহল আরও বেশী। কারণ তখন পর্য্যন্তও কোন নারী-বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান-জগতে কোন মৌলিক আবিষ্কার করে, খ্যাতিলাভ করতে পারেন নি।

সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে বৈজ্ঞানিকের অপেক্ষায় বসে আছেন। কতক কাল কেটে যাবার পর সবার উৎকণ্ঠা দূর করে সভাগৃহে প্রবেশ কর্‌লেন এক সৌম্যমূর্ত্তি তরুণী—সঙ্গে তার স্বামী। তিনিও একজন বৈজ্ঞানিক। উপস্থিত সবাই উঠে দাঁড়িয়ে সসম্মানে তাঁদের অভ্যর্থনা কর্‌লেন।

বৈজ্ঞানিক দুইজন প্রতিনমস্কার করে মঞ্চের উপরে গিয়ে বস্‌লেন।

আবিষ্কৃত যে-পদার্থটী সম্বন্ধে তাঁরা বক্তৃতা কর্‌বেন বলে স্থির ছিল—সে-জিনিষটীও তারা একটী কাঁচ-পাত্রে পূরে, সেই পাত্রটীকে একটা সীসার বাক্সে বন্ধ করে নিয়ে এসেছিলেন।

সভাস্থল নীরব-নিথর। বক্তৃতা আরম্ভ হলো। বৈজ্ঞানিক সীসার বাক্স থেকে কাঁচপাত্রটাকে খুলে টেবিলের ওপরে রাখলেন। বক্তৃতা আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সভা-গৃহের সমস্ত বাতি নিবিয়ে দেওয়া হলো।—আর বাতি নেবাবার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেলো। যেন কোন্ যাদুকরের মায়াদণ্ড স্পর্শে একটা তীব্র আলোক বেরিয়ে আস্‌তে লাগলো ঐ কাঁচ-পাত্রেরই ভেতর থেকে। কাণ্ড দেখে সবাই মুগ্ধ হয়ে গেলো।

মঞ্চের ওপরে বৈজ্ঞানিকদের অতি নিকটেই বসে ছিলেন পারস্যের সম্রাট্। সহসা অন্ধকারের মধ্যে এরূপ একটা তীব্র আলোক দেখে তিনি মনে মনে ভাবলেন—সভা-গৃহে হয়ত আগুন ধরে গেছে। তাই ভয় পেয়ে তিনি চেয়ার থেকে উঠে দূরে পালাতে গেলেন। হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠ্‌তে গিয়ে তাঁর ধাক্কা লেগে কাঁচ-পাত্রটী মাটীতে পড়ে গেলো।

এ ব্যাপারটী এত অল্প সময়ের মধ্যে ঘটে গেলো—যে বৈজ্ঞানিক প্রথম ব্যাপারটী মাত্রই বুঝ্‌তে পারেন নি—পরে বুঝ্‌তে পেরে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়্‌লেন। তিনি ভাবলেন হয়ত তার বহু সাধনার ধন—অপূর্ব্ব এই জিনিষটী নষ্ট হতে চল্‌লো। অনিচ্ছাকৃত এই ক্রুটীর জন্য পারস্যের সম্রাট অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে পড়লেন। তিনি বৈজ্ঞানিকের এই ক্ষতি পূরণ কর্‌বার জন্য তার হাতের বহুমূল্য হীরার আংটীটী খুলে বৈজ্ঞানিককে দিতে এগিয়ে গেলেন। এর মধ্যেই খোঁজাখুঁজি সুরু হয়েছিলো। যেই সম্রাট আংটীটী দেবার জন্য এগিয়ে গেছেন তখনই জিনিষটা মাটী থেকে উদ্ধার করে টেবিলের ওপরে রাখা হলো। সম্পূর্ণ জিনিষটী মাটী থেকে উদ্ধার করে টেবিলের ওপর রাখ্‌তে দেখে তিনি মনে মনে ভাবলেন, "যাক্ তাহ'লে জিনিষটী নষ্ট হয় নি।" তিনি মস্ত বড় একটা লজ্জার দায় থেকে মুক্তি পেলেন। কারণ টাকা-কড়ি বা হীরা-জহরত দিয়ে ও জিনিষের মূল্য নির্ণীত হতে পারে না।......এযে সাত রাজার ধন এক মাণিক।

যাক্ এরপর আবার বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা সুরু করলেন। তাঁর আবিষ্কারের সমস্ত কাহিনী এক এক করে সব বুঝিয়ে

বলতে লাগ্‌লেন। এই নূতন আবিষ্কারের ফলে যে বিজ্ঞান জগতে আরও কত নূতন নূতন গবেষণা ও আবিষ্কার করবার পথ মুক্ত হলো তা-ও তিনি বলে গেলেন। এ জিনিষের সাহায্যে পৃথিবীর কত ভাবে যে উপকার করা সম্ভব হবে সে কথাও বল্‌লেন। বহুক্ষণ ধরে বক্তৃতা হলো। শ্রোতারা সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মত নির্ব্বাক্ হয়ে তাঁর বক্তৃতা শুনে গেলো। যে-সমস্ত বৈজ্ঞানিক সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা প্রাণ খুলে এই মৌলিক আবিষ্কারের প্রশংসা করলেন। পারস্যের সম্রাট এই অদ্ভুত পদার্থটীর আশ্চর্য্য গুণাবলীর কথা শুনে এমনি খুসী হয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর দেহ থেকে বহুমূল্য রাজপোষাক খুলে বৈজ্ঞানিককে পরিয়ে দেবার জন্য এগিয়ে গেলেন। এতে বৈজ্ঞানিক অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে পড়্‌লেন। কারণ বহুমূল্য রাজ-পরিচ্ছদে তাঁর কোন প্রয়োজন ছিলো না। গবেষণাগারের নিভৃত কক্ষে বসে গবেষণা করতে ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চা করতেই তিনি পছন্দ করতেন—আড়ম্বর করা ছিল তাঁর নীতি-বিরুদ্ধ। সুতরাং রাজ-পরিচ্ছদে তাঁর কি প্রয়োজন?

এই শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ও তাঁর আবিষ্কৃত এই আশ্চর্য্য পদার্থটীর নাম জান্‌তে এখন নিশ্চয়ই হয়ত তোমাদের জানা কৌতূহল হচ্ছে।—এই বৈজ্ঞানিকের নাম

মাদাম কুরী—আর তাঁর আবিষ্কৃত পদার্থটীর নাম রেডিয়ম।

রেডিয়ম আবিষ্কার করে মাদাম কুরী এ যুগের বৈজ্ঞানিক-দের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন। তোমাদের কাছে পূর্ব্বে রন্‌জেন-রশ্মি বা X-Rayএর কথা বলেছি। সে প্রসঙ্গে রনজেন্ রশ্মি যে কিরূপ আশ্চর্য্য তীব্র তেজসম্পন্ন সেকথাও তোমরা শুনেছ; কিন্তু রেডিয়মের রশ্মি রন্‌জেন্ রশ্মির চেয়েও অধিক তীব্র ও উজ্জ্বল। এর রশ্মিও রন্‌জেন্ রশ্মিরই মত মানুষের শরীরের মধ্যে অবলীলাক্রমে প্রবেশ করতে পারে।

এই আশ্চর্য্য পদার্থটী আবিষ্কার করে, মাদাম কুরী যে সমগ্র মানবজাতির কি এক আশ্চর্য্য ও মহৎ উপকার করে গেছেন, সে কথা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। এজন্য সমগ্র মানবজাতি তাঁর কাছে চির-কৃতজ্ঞ থাকবে। তোমরা ক্যান্‌সার (Cancer) বা কর্কট রোগের নাম নিশ্চয়ই শুনেছ। এ ব্যাধি রেডিয়ম আবিষ্কারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ছিল "শিবেরও অসাধ্য।" কিন্তু রেডিয়ম আবিষ্কারের পর থেকে এই নিদারুণ ব্যাধি আরোগ্য করা সম্ভবপর হয়েছে। রেডিয়মের চিকিৎসা (Radium Treatment) ছাড়া এই ভীষণ ব্যাধি আরোগ্য করা কোনরূপেই সম্ভব নয়। সুতরাং তোমরা হয়ত এখন বুঝতে

পারছো রেডিয়ম আবিষ্কারের ফলে মানবজাতির কী কল্যাণ সাধিত হয়েছে! শুধু কি তাই? তা নয় এই আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞান-জগতেও নানারূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হয়ে বৈজ্ঞানিকদের বহুকালের বহু প্রাচীন সব বিশ্বাস পরিবর্ত্তিত হয়েছে। আরও যে কত কি হবার সম্ভাবনা আছে তা-ই বা কে বল্‌তে পারে।

তোমাদের যদি প্রশ্ন করা যায়—পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ ধাতু কি? তোমরা হয়ত বল্‌বে—সোনা। আর তোমাদের মধ্যে যারা একটু বেশী খোঁজখবর রাখ—তারা খুব বেশী যদি হয় ত বল্‌বে—প্ল্যাটিনাম; কিন্তু তা নয়। তোমাদের এ ধারণা যদি থেকে থাকে তবে তা' বদ্‌লে নিও। কারণ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান ধাতু হচ্ছে রেডিয়ম। রেডিয়মের নাম তোমরা হয়ত এই প্রবন্ধ পড়েই প্রথম জান্‌লে। এর পূর্ব্বে যদিও বা তোমরা কেউ এ নামটী শুনে থাক—কিন্তু এ জিনিষটী যে তোমরা কেউ দেখ নাই এ কথা সত্যি। কারণ এ জিনিষ যেখানে সেখানে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যে-পরিমাণ রেডিয়ম সংগৃহীত হয়েছে তা খুবই অল্প। তার ওজন কয়েক তোলা মাত্র হ'বে। ইচ্ছা করলে ছোট্ট একটা দেশলাইয়ের বাক্সের মধ্যেই তা পূরে বন্ধ করে

রাখা যায়। খুব বেশী পরিমাণে সংগ্রহ করা সম্ভব নয় বলেই এই জিনিষটী এমনি দুর্ম্মূল্য।

রেডিয়ম সত্যি সত্যি এক অদ্ভুত পদার্থ। এর যে কিরূপ তীব্র আলো দেওয়ার শক্তি আছে তা ত তোমাদের পূর্ব্বেই বলেছি। অন্ধকারের মধ্যে এ জিনিষটী একেবারে জ্বল্ জ্বল্ করে জ্বল্‌তে থাকে। দূর থেকে দেখে মনে হয় যেন খুব বেশী শক্তির একটা বিজলী বাতি জ্বল্‌ছে। রেডিয়মের শুধু যে আলো দেওয়ারই ক্ষমতা আছে তা' নয় এর তাপ দেওয়ারও শক্তি আছে। এক তোলা পাথুরে কয়লা পোড়ালে যে পরিমাণ তাপ পাওয়া যেতে পারে, ঐ পরিমাণ রেডিয়ম থেকে ওর দশলক্ষগুণ বেশী তাপ পাওয়া যাবে।

এ কথা শুনে তোমরা হয়ত মনে মনে ভাব্‌ছো—এর একটা টুক্‌রো যদি কোনরকমে পাওয়া যেত তা হ'লে কী মজাটাই না হোত! সকাল বেলায় উঠে চায়ের জল গরম করবার জন্য আর ষ্টোভ্ ধরাবার হাঙ্গামাটা পোয়াতে হতো না। কিন্তু তা-ও কি সম্ভব? না তা নয়। কারণ রেডিয়ম এমনি দুষ্প্রাপ্য জিনিষ যে, এর অভাবে পৃথিবীর বহু হাসপাতালে ক্যানসারের মত ব্যাধির চিকিৎসার বন্দোবস্ত পর্য্যন্ত করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। ধরে নাও,

যদিও বা ওর একটা টুক্‌রো পাওয়া যায়—তা হ'লে চায়ের জল গরম তা দিয়ে করা সম্ভব হবে না। কারণ সুস্থ মানুষের শরীরের মধ্যে যদি কোনক্রমে রেডিয়মের একটা সামান্য পরমাণুও প্রবেশ করতে পারে তা হ'লে তার মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটা অসম্ভব নয়। সুতরাং এ জিনিষ নাড়াচাড়া করবার অনেক বিপদ আছে। দেখ্‌লে কেমন অদ্ভুত এই পদার্থটা। এর সাহায্যে ব্যাধি নিরাময়ও করা যায় আবার সুস্থ শরীরে প্রবেশ করলে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়ে দেয়।

এই আশ্চর্য্য জিনিষটী যিনি আবিষ্কার করে গেছেন তাঁর জীবন-কথা ও কি করে তিনি এই জিনিষটী আবিষ্কার কর্‌লেন তা নিশ্চয়ই তোমরা জান্‌তে চাও। এই আবিষ্কারের পেছনে বৈজ্ঞানিকের কিরূপ অবিচলিত নিষ্ঠা ও কর্ম্মপ্রেরণা যে ছিল সে কথা শুন্‌লে তোমরা অবাক্ হবে। সেই কাহিনীই তোমাদের বল্‌ছি।

মাদাম কুরীর জন্ম হয় পোল্যাণ্ডের এক দরিদ্র পরিবারে। যদিও তাঁর বাবা পোল্যাণ্ডের ওয়ারস বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিজ্ঞানের খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন, তবু তাঁদের অভাব ছিল যথেষ্ট। কারণ যোগ্যতার হিসেবে মাদাম কুরীর বাবা মাইনে ভারী কম পেতেন। তাঁর মা-ও একটা মেয়েদের

কলেজে কাজ করতেন। তার মাইনেও তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। কাজে কাজেই অভাব তাদের লেগেই ছিল। মাদাম কুরীর কুমারী অবস্থায় নাম ছিল মেরী সক্লোডাউস্কী। বিয়ে হওয়ার পর তিনি স্বামীর কুরী উপাধি গ্রহণ করেন।

ছেলেবেলা থেকেই লেখাপড়ার দিকে মেরীর খুব বেশী ঝোঁক ছিল—বিশেষতঃ বিজ্ঞানের চর্চ্চায়। সাংসারিক অভাব অনটন ও আরও নানারকম অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও লেখাপড়ার দিকে তার কোনরূপ অমনোযোগ কখনও দেখা যায় নি। যার মা ও বাবা দু'জনেই শিক্ষাব্রতী তার পক্ষে এ রকম হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। ছেলেবেলা থেকেই মেরী বিদ্যালয়ের লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে, তার বাবার কাছে লেবরেটরীতে বসে বসে মনোযোগের সঙ্গে বিজ্ঞানের অনুশীলন করতেন। এ রকম ভাবে অতি অল্প বয়সেই মেরী বিজ্ঞানে বেশ জ্ঞানলাভ করে ফেললেন।

এই সময়ে নানা কারণে তাদের আথিক অবস্থা খুবই অসচ্ছল হয়ে পড়ে—অভাব অনটন বেড়ে যায়। মেরীর বাবা আর কোন উপায় না দেখে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করে তাকে লেবরেটরীর একটা অল্প মাইনের চাকুরী

নিয়ে দিলেন। এতে তাদের আর্থিক অসচ্ছলতা কতকটা দূর হলো বটে কিন্তু আর এক বিপদ এসে জুট্‌লো। এই সময় পোল্যাণ্ড ছিল রাশিয়ার অধীনে। কোন কারণে মেরী রাশিয়ার সম্রাটের বিরাগভাজন হয়ে পড়্‌লেন। আর তারই ফলে তার নির্ব্বাসন দণ্ড হলো। অল্প বয়সেই তাকে জনক-জননী ও আবাল্য পরিচিত স্বদেশের মায়া পরিত্যাগ করতে হলো। ঘুরতে ঘুরতে অত্যন্ত নিঃস্ব অবস্থায় মেরী ফরাসীদেশের রাজধানী প্যারিসে এসে উপস্থিত হলেন।

এরূপ ভীষণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়েও কিন্তু তার জ্ঞান অর্জ্জন করবার অদম্য স্পৃহা মাত্রও কম্‌লোনা। তিনি স্থির করলেন যে, প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হয়ে, আবার পড়াশুনো সুরু করবেন। কিন্তু পড়াশুনো করতে হলে'ত টাকা পয়সার প্রয়োজন। সে টাকা আস্‌বে কোথা থেকে? এই চিন্তায়ই মেরী ভারী বিব্রত হয়ে পড়্‌লেন। যাদের চেষ্টা থাকে সঙ্গে সঙ্গে ভগবানই তাদের উপায় মিলিয়ে দেন। সামান্য কিছু টাকা অতি কষ্টে সংগ্রহ করে মেরী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হয়ে গেলেন। এবার দারিদ্র্যের সঙ্গে তার সুরু হলো তুমুল সংগ্রাম। অতি কষ্টে তিনি যা কিছু টাকা পয়সা সংগ্রহ কর্‌তেন, তা দিয়ে প্রথমেই কিন্‌তেন বই তারপর যদি

কিছু বাঁচতো তবে অন্য ব্যয় করতেন। এজন্য অনেক সময় তাঁকে একবেলা আহার করে এবং কখনও কখনও অনাহারে পর্য্যন্ত থাক্‌তে হয়েছে। কিন্তু মেরী সে ক্লেশকে ক্লেশ বলেই মনে করেন নি। এমনি অদ্ভুত ছিল তাঁর বিদ্যার প্রতি অনুরাগ!

এখানে পেরী কুরী নামে একজন তরুণ অধ্যাপকের সঙ্গে মেরীর পরিচয় হয়। সবেমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করে এই যুবক অধ্যাপকের পদলাভ করেছিলেন। মেরীর এরূপ অদ্ভূত প্রবল বিদ্যানুরাগ অধ্যাপক কুরীর দৃষ্টি বিশেষ-ভাবে আকর্ষণ করে। এই অধ্যাপকটী রসায়ন শাস্ত্রে ছিলেন পরম পণ্ডিত। মেরীর আথিক অসচ্ছলতা যাতে দূর হতে পারে—যাতে শান্তিতে অনন্যমনা হয়ে তিনি পড়াশুনো করতে পারেন—অধ্যাপক কুরী সেজন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করতে আরম্ভ করলেন। একটা সুযোগও মিলে গেলো। এই সময় বিজ্ঞানের গবেষণাগারের একটা সহকারীর পদ খালি হলো। এ কাজ অধ্যাপক কুরীর সহকারীরই কাজ। অধ্যাপক কুরী চেষ্টা করে মেরীকে এই কাজে ঢুকিয়ে দিলেন। এবার মেরীর অর্থাভাব বহুল পরিমাণে দূর হলো। পরবর্ত্তী কালে এই অধ্যাপক পেরী কুরীর সঙ্গেই মেরীর বিয়ে হয়েছিল।

রেডিয়ম সম্বন্ধে সব কথা জানবার আগে গোড়ার দিককার কিছু কথা ভালো করে জেনে না নিলে, সব কথা বোঝ্‌বার সুবিধে হবে না। এক্‌স্‌ রে বা রন্‌জেন্‌ রশ্মির আবিষ্কারের গল্প তোমাদের পূর্ব্বেই বলেছি। এই এক্‌স্‌ রে যখন আবিষ্কৃত হলো, তখন বৈজ্ঞানিক মহলে রীতিমত হুলুস্থূল সুরু হয়ে গেলো—এই ধরণের অধিকতর তীব্র তেজসম্পন্ন আরও কোন রশ্মির সন্ধান পাওয়া যায় কিনা তাই নিয়ে বৈজ্ঞানিক মহলে রীতিমত গবেষণা আরম্ভ হলো। এরই ফলে আবিষ্কৃত হলো ইউরেনিয়ম সালফেট্‌ বলে একটী পদার্থ। এ জিনিষটীরও আলো দেওয়ার শক্তি আছে। আর এর আলোও অনেকটা রন্‌জেন রশ্মিরই গুণ-সম্পন্ন। এ জিনিষটী আবিষ্কার করেন একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক—নাম বেকরেল। তাঁরই নাম অনুসরণ করে এই রশ্মির নামকরণ করা হলো বেকরেল রশ্মি। এই ইউরেনিয়ম সালফেট্‌ জিনিষটী আবিষ্কৃত হয়েছিল পিচ্‌ব্লেণ্ড বলে এক রকম খনিজ পদার্থের মধ্যে।

গবেষণায় বেকরেল যে-প্রণালী অবলম্বন করেছিলেন সেই প্রণালী অনুসরণ করেই মাদাম কুরী গবেষণা আরম্ভ করলেন—উদ্দেশ্য আরও উজ্জ্বল কোন রশ্মির সন্ধান পাওয়া যায় কিনা। পিচ্‌ব্লেণ্ড নিয়ে মাদাম কুরীও পরীক্ষা সুরু

করলেন। কিছুকাল পরীক্ষার পর তিনি বুঝ্‌তে পারলেন যে, ইউরেনিয়ম ছাড়া অন্য এক প্রকার পদার্থ থেকেও ঐ প্রকার রশ্মি পাওয়া যায়। তিনি তার নাম দিলেন থোরিয়ম। আরও পরীক্ষা করবার পর তিনি বুঝ্‌লেন যে, বিশুদ্ধ ইউরেনিয়ম অপেক্ষা যে খনিজ পদার্থে (পিচব্লেণ্ড) ইউরেনিয়ম পাওয়া যায়, তার আলো দেওয়ার শক্তি বেশী। এই থেকেই তাঁর একটা দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে, পিচব্লেণ্ডের মধ্যে ইউরেনিয়ম ছাড়া এমন আরও কোন পদার্থ আছে, যার ফলেই এরূপ হওয়া সম্ভব হয়। তিনি মনে মনে ভাব্‌লেন যে, তাঁর বিশ্বাস যদি সত্য হয় তা হ'লে জগতের লোক তাদের কাছ থেকে এমন একটা নূতন কথা জান্‌তে পারবে যা এর পূর্ব্বে আর কেউই শোনাতে পারে নি। এ ব্যাপার বুঝ্‌তে পেরেই তিনি আর একটা অপূর্ব্ব আবিষ্কারের কল্পনায় একেবারে মেতে উঠ্‌লেন।

পূর্ব্বে তাঁর কোন সহকর্ম্মী ছিল না। এখন অধ্যাপক কুরীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হওয়ায় তাঁকে তিনি সহকর্ম্মীরূপে পেলেন। তোমাদের পূর্ব্বেই বলেছি, অধ্যাপক কুরী রসায়ন শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত ছিলেন। সুতরাং তাঁর সাহায্য মাদাম কুরীর ভারী কাজে এলো। স্বামী স্ত্রী দু'জনে মিলে এই পিচব্লেণ্ড নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ

করলেন। কী দারুণ মনোযোগ তাদের কাজে! দিন নেই রাত্রি নেই তাঁরা শুধু পরীক্ষার পর পরীক্ষাই করে চলেছেন।

কিছুকাল পরীক্ষা করবার পর তাঁরা আর একটা জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের সন্ধান পেলেন। মাদাম কুরীর মাতৃভূমি পোল্যাণ্ডের নাম অনুসারে এর নাম দিলেন তাঁরা পোলোনিয়ম। ঠিক যে-জিনিষটী তাঁরা পিচ্‌ব্লেণ্ডের মধ্যে আবিষ্কার করতে পারবেন বলে আশা করে কাজ সুরু করেছিলেন পোলোনিয়ম সে জিনিষ নয়। সুতরাং তাঁরা আবার নূতন উৎসাহে কাজ সুরু করলেন। আবার পিচব্লেণ্ড বিশ্লেষণ করে পরীক্ষা করা আরম্ভ হলো। কিন্তু তাদের এই গবেষণার কাজে মস্তবড় অন্তরায় হলো তাঁদের দারিদ্র্য। একে পিচ্‌ব্লেণ্ড অত্যন্ত মূল্যবান ধাতু তাতে বহু পরিমাণ পিচ্‌ব্লেণ্ড একসঙ্গে সংগ্রহ করে না নিতে পারলে কাজের মাত্রই সুবিধা হয় না। প্রচুর অর্থব্যয় করে একসঙ্গে বহু পরিমাণ পিচ্‌ব্লেণ্ড সংগ্রহ করে নেওয়া তাঁদের পক্ষে এক রকম কঠিন হয়ে উঠ্‌লো। এই গবেষণায় তাঁদের অত্যন্ত উৎসাহ লক্ষ্য করে ভিয়েনার বিজ্ঞান-পরিষদ তাঁদের এক টন পিচ্‌ব্লেণ্ড উপহার দিলেন। এবার কাজের অনেকটা সুবিধা হলো। এইভাবে বারো বৎসর কঠোর পরিশ্রম করে পিচ্‌ব্লেণ্ডের

মধ্যে তাঁরা এক স্বতঃ-জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ আবিষ্কার করতে সমর্থ হলেন। এই পদার্থের নামই দিলেন তাঁরা রেডিয়ম। অধ্যাপক কুরীর আর্থিক অবস্থা খুব সচ্ছল ছিল না। সুতরাং এই বারো বৎসর কাল দারিদ্র্যের সঙ্গেও তাঁদের অতি কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছে; এমন কি অনেক দিন তু'বেলা আহার্য্য পর্য্যন্ত সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে নি। তবু তাঁরা নিরুৎসাহ হ'ন নি। শেষ পর্য্যন্ত পূর্ণ উদ্যমে চেষ্টা করেছেন।

রেডিয়ম আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সমস্ত দেশে কুরী দম্পতির নাম ছড়িয়ে পড়্লো। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের সম্ভ্রান্ত বিজ্ঞান-পরিষদ ও সভা থেকে তাঁদের নিমন্ত্রণ আস্তে লাগ্লো এই বিষয় নিয়ে বক্তৃতা করবার জন্য। অনেক বিশ্ববিদ্যালয় তাঁদের স্বর্ণপদক ও অর্থ পুরস্কার দিলেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তাঁদের এই বিখ্যাত আবিষ্কারের জন্য তাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান, নোবেল পুরস্কার লাভ করলেন।

এই আবিষ্কারের পরও মাদাম কুরী এবং তাঁর স্বামী অধ্যাপক কুরী নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইলেন না। নব নব আবিষ্কার করে প্রকৃতির রহস্য ভেদ করবার চেষ্টায় নব উদ্যমে ব্রতী হলেন।

কিন্তু এই সময় সহসা বিনামেঘে বজ্রপাত হলো। ১৯০৬ সালে একদা রাজপথে ভ্রমণ-কালে মোটর গাড়ীর নীচে পড়ে, অধ্যাপক কুরীর লোকান্তর ঘট্‌লো। স্বামী ও সহকর্ম্মীর এই অস্বাভাবিক ও আকস্মিক মৃত্যুতে মাদাম কুরীর প্রাণ-মন হাহাকার করে কেঁদে উঠ্‌লো। বল্‌তে ভুলে গিয়েছি এর মধ্যে মাদাম কুরীর দু'টী কন্যা জন্মেছিলো। সেই শিশু কন্যা দু'টীকে স্নেহভরে বুকে চেপে, তিনি স্বামীর শোক ভুল্‌তে চেষ্টা কর্‌লেন। মাদাম কুরী এর পর স্থির করলেন যে, যে-বিজ্ঞান তাঁর স্বামীর অতি প্রিয় ছিল তারই সেবায় তিনি আপনাকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করবেন।

এপর্য্যন্ত তোমাদের কাছে রেডিয়ম আবিষ্কার করবার কাহিনীই বলেছি। কিন্তু এ জিনিষটী যে কি সেকথা স্পষ্ট করে এখনও তোমাদের বলা হয় নি।

পূর্ব্বে বলেছি রেডিয়মের তাপ দেওয়ার ক্ষমতা আছে—রেডিয়ম স্বতঃ-জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ এবং এর সাহায্যে কর্কট বা ক্যানসার নামক দুরারোগ্য ব্যাধি অতি সহজে নিরাময় করা যেতে পারে।—এই কথাগুলোই পরিষ্কার করে তোমাদের এখন বুঝিয়ে বলে, এই প্রবন্ধ শেষ করবো।

একজন সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকের ভাষায় তোমাদের কাছে রেডিয়মের বর্ণনা দিচ্ছি। তিনি বলেছেন—"রেডিয়মের এক

আশ্চর্য্য গুণ এই যে এর থেকে তেজ বিকীরণ হচ্ছে—রেডিয়মের মধ্যে যেন অফুরন্ত তেজের ভাণ্ডার আছে—কুবেরেব ধন,—দান করলেও ক্ষয় নাই। কোন উত্তপ্ত বস্তু তেজ বিকীরণ করে শীতল হয়—তার তেজের ভাণ্ডার নিঃস্ব হয়ে যায়—কিন্তু রেডিয়মে যেন তা হয় না। এক কণা রেডিয়ম থেকে এত তেজ বের হয় যে, চল্লিশ মিনিটের মধ্যে সেই তেজ রেডিয়ম কণার সমান পরিমাণ জলকে ফুটন্ত অবস্থায় আন্‌তে পারে। অথচ আপাত দৃষ্টিতে তাপ বিকীরণের জন্য রেডিয়মের কোন পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায় না। এই তেজের উৎস কোথায়? বৈজ্ঞানিক বলেন যে, রেডিয়মের এক একটা পরমাণু মাঝে মাঝে বিদীর্ণ হচ্ছে—কেন হচ্ছে তার কারণ জানা নেই। আর এই ভাবে বিদীর্ণ হওয়ার উপর মানুষের কোন হাত নেই। মানুষ তার আয়ত্তাধীন কোন শক্তির প্রয়োগে এই বিদীর্ণ হওয়া নিবারণ করতে বা বাড়াতে পারে না। রেডিয়ম ধাতুর পরমাণু এইরূপে বিদীর্ণ হয়ে অন্য ধাতুর পরমাণুতে পরিণত হয় আর সঙ্গে সঙ্গে পরমাণুর অন্তর্নিহিত শক্তি তেজরূপে বিকীর্ণ হয়।” রেডিয়মের এই অদ্ভুত শক্তির কথা শুনে তোমরা হয়ত খুবই আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছ? তোমরা হয়ত মনে মনে ভাব্‌ছো—“কেন এমন হয়?” এর উত্তরে যে

কথাগুলো বলতে হয় সে সব কথা—হয়ত তোমরা ভালো করে বুঝ্‌বে না। তাই সংক্ষেপেই বুঝিয়ে বল্‌ছি।

আমাদের দেশে বহু প্রাচীনকাল থেকেই লোকের বিশ্বাস ছিল যে, পঞ্চভূতে মিলে এই পৃথিবীর সব কিছুই তৈরী হয়েছে। এই পঞ্চভূত হচ্ছে ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। পাহাড় পর্ব্বত, নদী, সমুদ্র, গাছপালা, জীবজন্তু সব কিছুই এই পঞ্চভূতে তৈরী। সুতরাং এগুলোই হচ্ছে মৌলিক পদার্থ অর্থাৎ সব কিছু তৈরীরই উপাদান এগুলো। পৃথিবীর সমস্ত জিনিষই এই পাঁচটী উপাদানে বা এর সংমিশ্রনে প্রস্তুত হয়েছে।

কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের বিশ্বাস এ সম্বন্ধে সামান্য কিছু অন্যরকম ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বল্‌তেন—চারটী মাত্র মৌলিক উপাদান এই পৃথিবীতে আছে—আর তাই দিয়েই পৃথিবীর সব কিছু তৈরী হয়েছে। সে চারটী উপাদান মাটী, জল, আগুণ ও বাতাস।

কিন্তু কিছুকাল যাবার পর বৈজ্ঞানিকেরা বল্‌তে লাগ্‌লেন ওর কোনটাই মৌলিক পদার্থ নয়। অক্সিজেন, হাইড্রোজেন প্রভৃতি কতকগুলো বায়ব পদার্থ এবং গন্ধক, তামা, লোহা, সোণা, রূপা, পারদ প্রভৃতি কতকগুলো তরল ও কঠিন পদার্থই

পৃথিবীর সব কিছুর উপাদান এবং এগুলোই মৌলিক পদার্থ। মৌলিক পদার্থের সংখ্যা হচ্ছে বিরানব্বই।

ডেল্‌টন্ নামে একজন বৈজ্ঞানিক বল্‌লেন, যে, যদি এক টুক্‌রো সোনা বা লোহা নিয়ে ক্রমাগত শুধু গুঁড়ো করা যায় তা হ'লে শেষ পর্য্যন্ত যে জিনিষটী পাওয়া যাবে, সেটীও ঐ পদার্থেরই সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম কণা বা পরমাণু ছাড়া আর কিছুই নয়। এর আর কোনরূপ রূপান্তর হওয়া সম্ভব হবে না। সুতরাং এই পরমাণুগুলোই হচ্ছে প্রত্যেক জিনিষের মৌলিক উপাদান। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের—যেমন সোনা বা রূপার—পরমাণু বিভিন্ন। সুতরাং এর মৌলিক উপাদানও বিভিন্ন। বিজ্ঞানের গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের এ বিশ্বাসেরও পরিবর্ত্তন হলো।

পরীক্ষায় "পরমাণু-সিদ্ধান্ত" ভুল বলে প্রমাণিত হলো। বৈজ্ঞানিকেরা প্রমাণ করলেন, পরমাণুরও পরমাণু আছে আর সেই পরমাণুই হচ্ছে মৌলিক পদার্থ। এক জিনিষের পরমাণুর সঙ্গে অপর জিনিষের পরমাণুর একেবারেই প্রভেদ নেই। সুতরাং পৃথিবীর সব কিছু তৈরীরই মৌলিক উপাদান এক। এম্‌নি এর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু পরীক্ষাদ্বারা বেশ্ বোঝা যায়।

একটা কাঁচের গোলকে সামান্য চাপে কোন গ্যাস ভর্ত্তি করে, তার ভেতর দিয়ে যদি বিদ্যুত-প্রবাহ চালানো যায় তাহ'লে দেখা যাবে যে, গোলকের অপর দিক থেকে এক রকম নীল আভাযুক্ত রশ্মি বেরিয়ে আস্‌ছে। পরীক্ষা করে দেখা গেলো যে, এই রশ্মি বিদ্যুতের বাহন। আর এই রশ্মি অতি সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম পদার্থ কণা দিয়ে তৈরী। বৈজ্ঞানিকেরা আবার পরীক্ষা আরম্ভ করলেন যে, বিদ্যুতের বাহন এ জিনিষটী কি? পরীক্ষায় স্থির হলো যে, এগুলোও সূক্ষ্ম বিদ্যুতের কণা ছাড়া আর কিছুই নয়। সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক জে. জে. টম্‌সন এর একটা ওজনও ঠিক করে ফেল্‌লেন। এর ওজন অতি সামান্য। হাইড্রোজেনের পরমাণুর ১৮৫০ ভাগের একভাগ মাত্র। এই জিনিষটীই হচ্ছে পৃথিবীর সকল পদার্থের একমাত্র উপাদান। যা কিছু তোমরা দেখ্‌তে পাও সবই এই জিনিষটী দিয়েই তৈরী। বৈজ্ঞানিকেরা এর নাম দিয়েছেন ইলেক্‌ট্রন বা বিদ্যুতিন।

রেডিয়মের ভেতর থেকে অবিরত যে আলো ও তাপ বেরিয়ে আস্‌ছে তা এই বিদ্যুতিন ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমরা এখন প্রশ্ন করতে পার পৃথিবীর সব কিছুই যখন বিদ্যুতিন দিয়ে তৈরী তখন সব জিনিষের ভেতর থেকেই রেডিয়মের মত অবিরত আলো ও তাপ বেরোয় না কেন?

তা সম্ভব নয়। কারণ এই বিদ্যুতিনগুলো একটী প্রাচীর দিয়ে আবদ্ধ থাকে। এই প্রাচীর অতিক্রম করে বিদ্যুতিনের ছুটে আসা সকল ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। যে সব ক্ষেত্রে সম্ভব হয়—সে ক্ষেত্রে তারা বেরিয়ে এসে ক্রমে নূতন করে আবার একটা পদার্থ সৃষ্টি করে ফেলে। এই হিসেবে রেডিয়মকে পরিবর্ত্তনশীল ধাতু বলা চলে। কারণ রেডিয়মের ভেতর থেকে প্রতি মুহূর্ত্তে ভীষণ বেগে লক্ষ লক্ষ বিদ্যুতিন ছুটে বেরিয়ে আস্ছে। এই ছুটে বেরুবার বেগ এমনি ভীষণ যে, তা আমবা কল্পনায়ও আন্তে পারি না। বিদ্যুতিন প্রতি সেকেণ্ডে দেড়লক্ষ মাইল বেগে ছুটে বেরোয় এবং সম্পূর্ণ অন্য মৌলিক জিনিষ তৈরী করে ফেলে।

রেডিয়ম থেকে যেমন অন্যান্য মৌলিক পদার্থ সৃষ্টি হয়, বেডিয়মও তেমনি ঐ ভাবেই জন্মে থাকে। বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, খনির যে জায়গায় ইউরেনিয়ম পাওয়া যায় তার চারদিকে রেডিয়মও কিছু কিছু জমে থাকে। ইউরেনিয়ম যখন বিদ্যুতিন ত্যাগ করতে করতে ক্ষয় পেয়ে যায় তখনই লঘুতর ধাতু রেডিয়মের সৃষ্টি হয়। এই ব্যাপার লক্ষ্য করেই বৈজ্ঞানিকদের মনে একটা বিশ্বাস জন্মেছে যে, কালে হয়ত কঠিনতর ধাতুকে লঘুতর ধাতুতে পরিণত করা অসম্ভব হবে না। সীসা সোনা অপেক্ষা লঘুতর।

সুতরাং সীসা যদি কালে সোনায় পরিণত হয়, তবে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই থাক্‌বে না। এখন হয়ত ব্যাপারটা তোমরা বুঝ্‌তে পেরেছ।

এবারে রেডিয়মের সাহায্যে কি করে ক্যান্‌সার বা কর্কট রোগ আরোগ্য করা হয় সেই কথাই তোমাদের বল্‌বো। যে-সমস্ত চিকিৎসালয়ে রেডিয়ম চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে সেখানে প্লাটিনাম ধাতুতে তৈরী ছোট ছোট ফাঁপা সূঁচ রাখা হয়। সূঁচের ফাঁপা জায়গায়টা রেডিয়মের কয়েকটী কণা দিয়ে ভর্ত্তি করে, সেই সূঁচটীকে ক্যানসার রোগে আক্রান্ত স্থানে প্রবেশ করিয়ে কয়েকদিন রাখা হয়। প্লাটিনাম ভেদ করে রেডিয়মের তীব্র রশ্মি বেরিয়ে এসে আক্রান্ত কোষ-সমূহকে আঘাত করতে করতে ক্রমে সুস্থ করে তোলে। এইরূপেই এই মারাত্মক ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

রেডিয়ম থেকে প্রতিনিয়ত যে রশ্মি তীব্রবেগে ছুটে বেরিয়ে আস্‌ছে, বৈজ্ঞানিকেরা তাকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করে তার নাম দিয়েছেন আল্‌ফা, বিটা ও গামা। এই তিনটী রশ্মির মধ্যে গামা রশ্মিই সব চেয়ে বেশী তীব্র। এই কারণে চিকিৎসায় এই রশ্মিই ফলপ্রদ হয়ে থাকে। এই রশ্মির তেজ এত বেশী যে পুরু সীসার পাত ভেদ করে পর্য্যন্ত বেরিয়ে যেতে পারে। নানা রোগেই আজকাল বৈজ্ঞানিকেরা

রশ্মি-চিকিৎসার ব্যবস্থা করে থাকেন। আর তার ফলও খুবই ভাল হচ্ছে।

এই কারণে আজকাল পৃথিবীর সর্ব্বত্রই রেডিয়মের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কিন্তু প্রয়োজন অনুযায়ী রেডিয়ম সংগ্রহ করা মোটেই সম্ভবপর হচ্ছে না। কারণ রেডিয়মের মত দুষ্প্রাপ্য জিনিষ বোধহয় পৃথিবীতে আর বেশী নেই।

প্রতিনিয়ত রেডিয়ম থেকে আলোক বেরোয় বলে আজকাল নানা কাজেই রেডিয়মের ব্যবহার সুরু হয়েছে। তোমরা দিগ্‌দর্শন যন্ত্র কাকে বলে তা হয়ত জান। এই দিগ্‌দর্শন যন্ত্রে যে সব কাঁটার সাহায্যে দিকগুলো দেখানো হয়, সেগুলোতেও আজকাল রেডিয়ম ব্যবহার করা হচ্ছে। এ ছাড়াও বৈজ্ঞানিকেরা আরও নানা কাজে এ জিনিষটীর ব্যবহার আরম্ভ করেছেন।

অন্যান্য মৌলিক আবিষ্কারের জন্য মাদাম কুরীকে আরও একবার নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। দু'বার নোবেল পুরস্কার লাভ আর কোন বৈজ্ঞানিকের ভাগ্যেই ঘটে নি।

মাদাম কুরী আজ আর বেঁচে নেই বটে কিন্তু তিনি এই আবিষ্কার করে বিজ্ঞানকে যে-ভাবে সমৃদ্ধ করেছেন এবং এর ফলে মানুষের যে মহৎ উপকার সাধিত হয়েছে, তার জন্য যুগ যুগ ধরে লোকে তাঁকে স্মরণ করবে।

মাদাম কুরীর প্রণালী অনুসরণ করে আজকাল আরও অনেক বৈজ্ঞানিক কয়েকটী স্বতঃ জ্যোতির্ম্ময় মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করেছেন সত্য কিন্তু সেগুলো রেডিয়মের মত তত তীব্র তেজ সম্পন্ন নয়।

রেডিয়ম-বিজ্ঞানের আলোচনার জন্য আজকাল পদার্থ বিজ্ঞানের একটা নূতন বিভাগ গড়ে উঠেছে। এই বিভাগের নাম দেওয়া হয়েছে "রেডিও এক্‌টিভিটী।" বৈজ্ঞানিকেরা আশা করছেন যে, বিজ্ঞানের এই বিভাগের গবেষণার ফলে কালে হয়ত বা এমন সব অসাধ্য সাধিত হবে যা মানুষ স্বপ্নেও কখনও কল্পনা করতে পারে নি।

আকাশ কেন নীল?

সুদূর বিস্তৃত আকাশ—দূরে—আরও দূরে যতদূর দৃষ্টি চলে—শুধু দেখা যায় নীল আর নীল—যেন সেখানে নীল বর্ণের একটা মহোৎসব সুরু হয়েছে।

আকাশে নীলবর্ণের এ বিরাট সমারোহের কি কারণ?

আকাশের গায়ে নীল বর্ণের এই আশ্চর্য্য প্রাচুর্য্য লক্ষ্য করে, কবি মুগ্ধ হয়ে ছন্দে ও গানে এর বন্দনা-গীতি গেয়েছেন, দার্শনিক এর মাঝে ভগবানের মহিমার অপরূপ বিকাশ দেখে মুগ্ধ-বিস্ময়ে বারংবার তাঁরই চরণে প্রণতি জানিয়েছেন। কিন্তু এর সত্যিকার যে কারণ তা নির্ণয় করেছেন বৈজ্ঞানিক। এই কারণই তোমাদের বল্‌ছি।

এর কারণ আর কিছুই নয়, এ-ও আমাদের সে-ই চির-পরিচিত সূর্য্যের আলোরই একটা কারসাজী মাত্র। পূর্ব্বে "আলোক চিকিৎসা" প্রবন্ধে আলোক সম্বন্ধে অনেক কথাই তোমাদের বলেছি। তোমরা সেই প্রবন্ধেই পড়েছ, খালি চোখে এম্‌নি সূর্য্যের আলোককে সাদা বলে মনে হলেও এতে সাতটী বিভিন্ন বর্ণের রশ্মির সমাবেশ আছে। এই বর্ণ-সপ্তককেই কহে বর্ণচ্ছত্র (Spectrum)। আলোকের জন্ম-রহস্য সম্বন্ধেও অনেক কথা তোমরা পূর্ব্বেই জেনে

নিয়েছ। ইথারের ছোট বড় নানারকম ঢেউ থেকে যে কি ভাবে নানা শ্রেণীর আলোর জন্ম হয়ে থাকে, সে কথাও এখন আর তোমাদের কাছে কিছু নূতন নয়। এখন তোমাদের কাছে আলোকের সম্বন্ধে আর একটা নূতন কথা বল্‌ছি।

সূর্য্যের আলোকে যদি বিভিন্ন বর্ণের রশ্মির সমাবেশ না-ই থাক্‌তো তবে আমরা হয়ত পৃথিবীতে আর নানা রঙ্‌-বেরংয়ের চমৎকার সব জিনিষ দেখ্‌তে পেতাম না। রঙীন্‌ পাখাওয়ালা প্রজাপতি, বিভিন্ন বর্ণের সুন্দর সুন্দর ফুল, গাছপালা সবই হয়তো আমাদের চোখের ওপরে উৎকট কালো হয়ে ফুটে উঠ্‌তো। আচ্ছা, তাহ'লে একবার ভেবে দেখতো অবস্থাটা কি হতো? পৃথিবীর এমন অপরূপ সৌন্দর্য্য—বর্ণে বর্ণে যার অপূর্ব্ব প্রকাশ তা আমরা কি আর সুন্দর বলে মনে করতে পারতাম। এ ব্যাপার হলে যে পৃথিবীতে আমাদের টেকাই দায় হয়ে উঠ্‌তো।

কথাটা শুনে তোমরা হয়ত একেবারে বিস্ময়ে অবাক্‌ হয়ে গিয়েছ। কেমন তাই নয় কি? তোমরা হয়ত মনে মনে ভাবছো এ আবার কেমন কথা হলো। পৃথিবীর বিভিন্ন বর্ণের জিনিষের সঙ্গে সূর্য্যের আলোর রশ্মির আবার এমন একটা কি সম্পর্ক আছে যার ফলে ওরূপ হওয়া সম্ভবপর। কিন্তু যা বলেছি তা একেবারে সম্পূর্ণ

সত্যি—এতে কোথাও ফাঁকির লেশমাত্রও নেই. সূর্য্যের আলোকের সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন বর্ণের জিনিষের যথেষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন জিনিষের ওপর সূর্য্যের আলোর প্রতিফলনের ফলেই এই আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটে থাকে। কথাটা হয়ত তোমরা ঠিক বুঝ্‌লে না; কথাটা একটু বুঝিয়েই বলছি।

কোন একটা পাতলা জিনিষকে যদি একটা শক্ত জিনিষের গায় ছু'ড়ে মারা যায়, তাহ'লে সেটা লাফিয়ে আবার ফিরে আসে। যেমন ধর, একটা রবারের ফাঁপা বলকে নিয়ে, তুমি একটা পাথরের ওপর ছুঁড়ে মারলে—তা'হলে তার ফল কি হবে? ঐ বলটা কি ছিট্‌কে লাফিয়ে ফিরে আস্‌বে না! নিশ্চয়ই আস্‌বে। আলোকের সম্বন্ধেও ঠিক এই একই কথা খাটে। তোমরা নিশ্চয় লক্ষ্য করে দেখেছ যে সূর্য্যের রশ্মি যদি কাঁচ বা ঐরকম কোন চক্‌চকে জিনিষের ওপরে পড়ে, তাহলে সেই রশ্মি ঠিক্‌রে পড়ে। কেন পড়ে তা পরে বল্‌ছি। একেই বলে আলোকের প্রতিফলন।

বিভিন্ন জিনিষের ওপর আলোকের বিভিন্ন প্রকার প্রতিফলন হয়ে থাকে। তোমরা জান যে, আলোকের গতির বেগ অতি দ্রুত। প্রতি মুহূর্ত্তে আলোক বহুদূর চলে যেতে পারে। আলোক দ্রুত গতিতে চল্‌তে চল্‌তে

যখনই এসে কোন জিনিষের গায়ে বাঁধা পায়, তখনই ঠিক্‌রে প্রতিফলিত হয়। যতটা আলোক একটা জিনিষের ওপর পড়ে তার সবটাই প্রতিফলিত হয় না। ওর কতক অংশ ঐ জিনিষ নিজের মধ্যে শোষণ করে একেবারে আত্মসাৎ করে ফেলে, আর বাকী অংশের প্রতিফলন হয়ে থাকে। এ হচ্ছে জিনিষের স্বভাব বা ধর্ম্ম। কথাটা এইখানে আরও একটু পরিষ্কার করে বুঝিয়ে না বল্‌লে তোমরা হয়ত বুঝ্‌বে না।

পূর্ব্বে "আলোক চিকিৎসা" প্রবন্ধে তোমাদের বলেছি যে, লাল কাঁচের ভেতর দিয়ে সূর্য্যের কিরণ প্রবেশ কর্‌লে, আলোকের বর্ণচ্ছটার লাল ভিন্ন অপর রশ্মিগুলো বিনষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু কেন এমন হয়, সে কথাটা এখনও তোমাদের বলা হয় নি. অতি সহজ পরীক্ষা থেকেই ব্যাপারটা তোমরা অনায়াসে বুঝে নিতে পার্‌বে। তোমরা সূর্য্যের আলোকের বর্ণচ্ছত্র থেকে প্রিজম্ (Prism) বা আতস কাচের সাহায্যে লালবর্ণের রশ্মিটাকে বিশ্লেষণ করে নিয়ে, যদি কোন লাল বর্ণের জিনিষের ওপরে ফেলতে পার, তবে দেখ্‌বে যে, ঐ জিনিষটার বর্ণ আরও উজ্জ্বল লাল হয়ে উঠেছে—মনে হবে যেন হঠাৎ লাল বর্ণটা বিশেষভাবেই বৃদ্ধি পেয়ে গেলো। লাল রশ্মি লালবর্ণের জিনিষের ওপর ফেলায়

বর্ণটা কেন এত বৃদ্ধি পেয়ে গেলো তোমরা হয়ত তা বুঝ্তে পার নি। এর কারণ হচ্ছে এই যে, যে-জিনিষের বর্ণ লাল তার ওপর যখন সূর্য্যের রশ্মি পড়ে, তখন সেই জিনিষটী সূর্য্য-রশ্মির বর্ণচ্ছটা থেকে লাল ভিন্ন অপর সমস্ত বর্ণের রশ্মিকেই শোষণ করে নিজের ভেতরে গ্রহণ করে নেয়। আর লাল বর্ণের রশ্মিটা ঐ জিনিষে বাধা পেয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে না পেরে প্রতিফলিত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চোখের দৃষ্টিকেও রাঙিয়ে লাল করে তোলে। এই কারণেই আমরা সে জিনিষটীর বর্ণ লাল দেখে থাকি।

লালবর্ণের কোন জিনিষের ওপব লালবর্ণের রশ্মি পড়্লে ঐ জিনিষ তা শোষণ করতে পারে না। সুতরাং ঐ রশ্মি প্রতিফলিত হয়ে ঐ জিনিষটী আমাদের চোখে আরও উজ্জ্বল লাল হয়ে ওঠে। যে জিনিষে বর্ণচ্ছত্রের লাল রশ্মি প্রতিফলিত হয় তাকে আমরা দেখি লাল, আর যে জিনিষে সবুজ বর্ণের রশ্মি প্রতিফলিত হয় তাকে দেখি সবুজ, এমনি কমলা, নীল, হল্‌দে প্রভৃতি সবার বেলায়ই এই একই নিয়ম। তা হলে দেখা যাচ্ছে কোন জিনিষেরই কোন সত্যিকার বর্ণ নেই। সবই হচ্ছে সূর্য্যের আলোকের কারসাজী এবং জিনিষগুলোর প্রতিফলন করবার বিভিন্ন প্রকৃতি বা স্বভাবমাত্র।

আমার এ কথাগুলো শুনে তোমরা হয়ত মনে মনে ভাব্ছো, তা হ'লে আকাশের বর্ণ নীল কেন ? আকাশ ত আর সত্যি সত্যি কোন জিনিষ নয়। আকাশ যে কোন জিনিষ নয়, একথা অতি সত্যি। কিন্তু একটা কথা—আকাশ নিজে কোন জিনিষ না হলেও এতে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিষের অস্তিত্ব আছে এবং বৈজ্ঞানিকেরা এর প্রমাণও পেয়েছেন। আকাশের সর্ব্বত্রই সকল সময় অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধূলিকণা ভেসে বেড়াচ্ছে। আকাশ কখনও ধূলির এই অণুপরমাণু থেকে মুক্ত থাকে না। পরীক্ষা করে বৈজ্ঞানিকেরা আকাশের অতি উঁচু জায়গায়ও ধূলিকণার অস্তিত্বের প্রমাণ পেয়েছেন।

তোমাদের পূর্ব্বেই বলেছি ইথারের ছোট বড় বিভিন্ন প্রকার ঢেউয়ে বিভিন্ন প্রকার রশ্মির জন্ম হয়। সূর্য্যের আলোকের বর্ণচ্ছত্রের লাল, সবুজ, হলদে প্রভৃতি রশ্মিগুলো জন্মে ইথারের বড় বড় ঢেউ থেকে। এই বড় ঢেউগুলো সাধারণ ভাবে চল্‌বার সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুপরমাণুতে কোনরকম বাধা পায় না। সেগুলো অতিক্রম করে অনায়াসে চলে যায়। বাধা পায় শুধু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউয়ে যে সব রশ্মির জন্ম—সেগুলো। এর মধ্যে নীলবর্ণের রশ্মি অগ্রতম। অণুপরমাণুর মধ্যস্থিত বিদ্যুতিনে বাধা পেয়েই

নীলবর্ণের রশ্মিটা বিশেষরূপে প্রতিফলিত হয় এবং চারদিকে ঐ নীল বর্ণ বিচ্ছুরিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে আকাশকে একেবারে নীলে নীলে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

সময় সময় আবার আকাশের গায় অন্য রংও দেখা যায়। পৃথিবীর চারদিকেই বাতাসের একটা আবরণ রয়েছে আর আকাশও সব সময়েই ধূলির কণায় পরিপূর্ণ থাকে। সূর্য্যের আলোক সব সময়েই এই বাতাসের স্তর ও ধূলির কণা ভেদ করে পৃথিবীতে নেমে আসে। কখন সূর্য্যের আলোককে সব চেয়ে বেশি বাতাসের স্তর ও ধূলির কণা ভেদ করে আস্‌তে হয় বল্‌তে পার? সকাল ও বৈকাল বেলা। সে সময় সূর্য্য পূর্ব্বে ও পশ্চিমে টের্‌চা ভাবে হেলান থাকে। সব চেয়ে কম বাতাস ও ধূলির স্তর ভেদ করে সূর্য্যের আলো কখন আসে? যখন সূর্য্য একেবারে সোজাসুজিভাবে আমাদের মাথার ওপরে থাকে অর্থাৎ ছুপুর বেলা। সুতরাং সূর্য্যের আলো চলার পথে সব চেয়ে বেশি বাধা পায় সকাল ও বৈকাল বেলা আর সব চেয়ে কম বাধা পায় ছুপুর বেলা। সকাল ও বৈকাল বেলা বেশি পথ অতিক্রম করতে গিয়ে আলোক রশ্মির ছোট ছোট ঢেউগুলো আকাশে অবস্থিত অণুপরমাণুগুলোতে এমনই শক্ত বাধা পায় যে,

সেগুলো প্রতিফলিত হয়েও আর নীচে নাম্‌তে পারে না। কেবল আলোক-রশ্মির বড় বড় ঢেউগুলো, যেমন লাল, হল্‌দে, সবুজ প্রভৃতি, প্রতিফলিত হয়ে সব বাধা অতিক্রম করে নীচে নেমে আসে। তাই দুপুর বেলাকার আকাশই দেখায় সব চেয়ে বেশি নীল আর সকাল ও বৈকাল বেলা আকাশের গায় বর্ণচ্ছটার নানা বর্ণের চমৎকার খেলা দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের ভূতপূর্ব্ব প্রধান অধ্যাপক চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন্‌ একদা বিলেত থেকে জাহাজে ভারতবর্ষে ফেরবার পথে ভূমধ্যসাগরের মাঝে এসে, আকাশের দিকে তাকিয়ে সেখানে নীল বর্ণের অদ্ভুত প্রাচুর্য্য লক্ষ্য করে একেবারে মুগ্ধ হয়ে যান্‌। প্রকৃতির এই অদ্ভুত রহস্য তাঁর মনে একটা কৌতূহল জাগিয়ে তোলে। এর সত্যিকার কি কারণ—তাই জান্‌বার জন্য তিনি বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন।

এইখানে এর গোড়ার কথা একটু বলে নেওয়া প্রয়োজন। সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ বৈজ্ঞানিক লর্ড র‍্যালে আকাশের বর্ণ কেন নীল—সর্ব্বপ্রথম এর একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেন। টিণ্ডেল নামে অপর একজন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদ্বারা লর্ড র‍্যালের ঐ ব্যাখ্যা প্রমাণ করে দেন। লর্ড র‍্যালে

দেখিয়েছিলেন যে, আকাশে সব সময় যে ধূলিকণা উড়ে বেড়ায় তাতে আলোক তরঙ্গ বাধা পেয়েই এই অদ্ভুত প্রাকৃতিক রহস্যের সৃষ্টি করে। এই বিষয়ের গবেষণা সম্পূর্ণ করবার পূর্ব্বেই তাঁর মৃত্যু হয়। তার পর তাঁর পুত্র পিতার অসমাপ্ত কার্য্য সমাপ্ত করবার জন্য গবেষণা আরম্ভ করেন।

কলিকাতায় ফিরে এসে রামন্ এই সব গবেষণার সূত্র অবলম্বন করে এ বিষয়ে গবেষণা করতে আরম্ভ করেন। বহু বৎসরের সাধনা ও গবেষণার ফলে রামন্ কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গবেষণাগারে বসে "আকাশের বর্ণ কেন নীল" —এর প্রকৃত কারণ নির্ণয় করতে সমর্থ হ'ন। আকাশে যে সূক্ষ্ম পদার্থ সমূহ বিদ্যমান তাতে আলোকের বর্ণচ্ছটার রশ্মিবিশেষের প্রতিফলনের ফলে আলোক রশ্মির একত্রীভূত বিচ্ছুরণ হয় এবং সেই কারণেই আকাশের বর্ণ নীল দেখায়। এটাই তিনি পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণ করে দেন। প্রিংস্‌হাইম প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিতগণও পরীক্ষাদ্বারা রামনের এই আশ্চর্য্য আবিষ্কার প্রমাণ করেছেন।

বিজ্ঞানের ইতিহাসে ঐ বৎসরটা বিশেষ স্মরণীয় হয়ে থাক্‌বে। ১৯২৮ সালের ঘটনা এটা। "আলোক-রশ্মির বিচ্ছুরণ" বিষয়ে তাঁর এই আবিষ্কারের ফলে সে সময় বিজ্ঞান-জগতে একটা হুলুস্থুল পড়ে যায়। এ সম্বন্ধে তিনি

যে সব নূতন তথ্য আবিষ্কার করেছেন, তার ফলে বৈজ্ঞানিকদের বহু প্রাচীন বিশ্বাস ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়ে গেছে। তাঁরই নাম অনুসরণ করে তাঁর আবিষ্কারের নামকরণ করা হয়েছে "রামন্ এফেক্ট" বা "রামন্ রশ্মি"। রামন্ এই আশ্চর্য্য আবিষ্কার করে, বিজ্ঞান জগতে আমাদের দেশের সম্মান যে কতখানি বৃদ্ধি করেছেন তা আর বলে শেষ করা যায় না। এর জীবন-কথা সংক্ষেপে কতকটা বলেই এই প্রবন্ধ শেষ করবো।

মাদ্রাজ প্রদেশের তাঞ্জোর জেলায় এঁদের পিতৃ-পুরুষের আদি নিবাস। এঁদের বংশ অতি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বংশ। এ বংশে সংস্কৃত-সাহিত্য, ভারতীয় দর্শন প্রভৃতির বহু খ্যাতনামা পণ্ডিত জন্মেছেন। এঁদের পরিবারের জ্ঞান অর্জ্জনের স্পৃহাও বরাবরই খুব বেশী। একদা রামনের পিতৃব্য মাদ্রাজের তাঞ্জোর জেলা থেকে সুদূর বঙ্গদেশের নবদ্বীপে ন্যায়দর্শন পড়্‌বার জন্য এসেছিলেন। জ্ঞান অর্জ্জনের স্পৃহা খুব বলবতী না হলে পথের অসংখ্য ক্লেশ সহ্য করে কি কেউ এত দূর আসে। আজকালকার মত সহজে যাতায়াত কর্‌বার জন্য তখন রেলগাড়ী ত আর ছিল না। সুতরাং পায়ে হেঁটেই তাঁকে আস্‌তে হয়েছিল। একবার ভেবে দেখ ত কি কঠিন ব্যাপারখানা! রামনের

বাবা অন্ধ্রদেশের ভিজিয়ানাগ্রামে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে সেখানেই তাঁর জন্ম হয়।

প্রতিভাবান পুরুষের প্রতিভার বিকাশ বাল্যকালেই হয়ে থাকে। স্কুল ও কলেজের ছাত্রাবস্থায়ই তিনি বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি প্রতি বৎসরই পরীক্ষায় একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে, সম্মানলাভ করতেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি বহু পুরস্কার এবং বৃত্তিও পেয়েছেন। মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সী কলেজে যখন তিনি এম্. এস্-সি পড়্ছিলেন, সে সময়েই পদার্থ বিজ্ঞানের এমন চমৎকার একটী মৌলিক আবিষ্কার করেন, যে. তা দেখে সেখানকার ঐ বিষয়ের প্রধান অধ্যাপক মিষ্টার জোন্স্ একেবারে মুগ্ধ হয়ে যান্। পদার্থ বিজ্ঞানে রামনের এই অদ্ভুত মেধার পরিচয় পেয়ে, এম্. এস্-সি পাশ করার পর অধ্যাপক জোন্স্ তাঁকে শিক্ষা-বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু কোন কারণে রামন্ তাতে স্বীকৃত হতে পারেন নি।

তিনি এম্. এস্-সি পাশ করে, মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে ভারত সরকারের ফাইনান্স বিভাগের চাকুরীর জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিলেন এবং সসম্মানে

উত্তীর্ণ হয়ে ডেপুটী একাউন্টেন্ট জেনারেলের পদ লাভ কর্‌লেন। এই চাকুরীতে যেমন দায়িত্ব তেমনি এর মাইনেও বড় কম নয়। প্রায় পাঁচশো টাকা থেকে এই চাকুরী সুরু করতে হয় এবং ক্রমে তা' বৃদ্ধি পেয়ে তিন হাজার টাকা পর্য্যন্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। এইরূপে সরকারী দপ্তরে বসে ভারত সরকারের লাভ লোকসানের হিসাব কষ্‌তে কষ্‌তে তিনি তাঁর জীবনের প্রথম অধ্যায় সুরু করেন।

সরকারী দপ্তরের হিসাব-নিকাশ ও লাভ-লোকসানের নীরস আব্‌হাওয়ার মধ্যে পড়েও রামনের অফুরন্ত কর্ম্ম-প্রেরণা শুকিয়ে যায় নি। দায়িত্বপূর্ণ কঠোর কাজের ফাঁকে ফাঁকে যখনই তিনি অবসর পেতেন তখনই পদার্থ বিজ্ঞানের চর্চ্চায় মনোনিবেশ কর্‌তেন। এইভাবে এই দায়িত্বপূর্ণ কাজে অধিষ্ঠিত থেকেও তিনি পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষণা করে কয়েকটী মৌলিক আবিষ্কার করেন। এবং এইসব আবিষ্কারের কথা ইয়োরোপীয় বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকায় প্রকাশ করেন। মাসের পর মাস বিভিন্ন পত্রিকায় এই রকম সব প্রবন্ধ প্রকাশ করে, তিনি সবাইকে অবাক্ করে দিতে লাগলেন। সকলেই আশ্চর্য্য হয়ে মনে মনে ভাব্‌তো, এরূপ গুরু দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে, সমস্ত দিন দারুণ

পরিশ্রম করবার পর, বিজ্ঞানের গবেষণা করবার মত এমন কঠিন কাজের জন্য তিনি কখন সময় পান ?

এরপর সহসা রামনের ভাগ্যচক্র অন্য পথে পরিচালিত হয়ে পড়্লো। ১৯১২ সালে রামন্ কলিকাতায় বদলী হয়ে এলেন। এখানে এসেই তাঁর প্রতিভা পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পেলো। রামন্ আজ বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বলে, যে খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন, কলিকাতায় না এলে হয়ত বা তার ভাগ্যে তা লাভ করা ঘটে উঠ্তো না। হয়ত বা সরকারী হিসাব-বিভাগের কাগজ পত্র ঘেঁটে ঘেঁটেই তাঁর কর্ম্মজীবনের অবসান হতো। এখানে এসে বিজ্ঞানের চর্চ্চা কর্বার তাঁর মস্তবড় একটা সুযোগ মিলে গেলো।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিক মহেন্দ্রলাল সরকার ভারতবাসীরা বিজ্ঞান অনুশীলন করবার যাতে সুযোগ পেতে পারে, এই উদ্দেশ্যে একটী পরিষদ গঠন করেন। এই পরিষদের জন্য তিনি একটী গবেষণাগারও স্থাপন করেন এবং সেখানে বহু মূল্যবান বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাঁতির আমদানী করে একটী সম্পূর্ণ পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর আশা ছিল এই বিজ্ঞান-মন্দিরের তলে বসে গবেষণা করে ভারতবাসী বৈজ্ঞানিকেরা নূতন নূতন আবিষ্কারের

সাহায্যে দেশবাসীর দুঃসহ দারিদ্র্য ও ঘোর কুসংস্কার দূর করে দেশমাতৃকাকে নানাভাবে সম্পদশালিনী করে তুলবে।

কলিকাতায় এসে রামন্ এই বিজ্ঞান-মন্দিরের গবেষণাগারেই গবেষণা সুরু করলেন। যতক্ষণ অফিসের কাজ থাক্‌তো, ততক্ষণ সেখানে কাজ করতেন, আর বাকী সময় গবেষণাগারেই কাটাতেন।

এই সময়ে কলিকাতার দুইজন সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী, স্যার রাসবিহারী ঘোষ ও স্যার তারকনাথ পালিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-বিভাগকে সুগঠিত করে তোলবার জন্য বহু লক্ষ টাকা দান করেন। এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার ছিলেন স্বর্গীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। বিজ্ঞানের বিবিধ বিভাগে যোগ্য অধ্যাপক নিয়োগ করবার ব্যাপার নিয়ে তিনি মহা সমস্যায় পড়ে গেলেন। কারণ তখনও ভারতবাসীর মধ্যে বিজ্ঞান চর্চ্চা তেমন প্রসার লাভ করে নাই। এই সমস্ত কাজে ভারতবাসী নিয়োগ করাই প্রত্যেকের উদ্দেশ্য। স্যার আশুতোষ পূর্ব্বেই রামনের প্রতিভার পরিচয় পেয়েছিলেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন, রামনের মত একজন প্রতিভাশালী তরুণ বৈজ্ঞানিককে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করতে পারলে সব দিক দিয়েই ভাল হয়।

কিন্তু সমস্যা ছিল—এত মাইনের একটা সরকারী চাকুরী ছেড়ে দিয়ে কি করে তাঁকে তিনি অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলেন। তবুও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে, তাঁকে পদার্থ বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপকরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করতে আহ্বান করলেন। আশুতোষ বুঝেছিলেন যে, রামনের মত প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিক এ কাজে বিশেষ সফলতা লাভ করতে পারবেন। বিজ্ঞানের প্রতি রামনের বরাবরই একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ রয়েছে। সুতরাং তিনি আশুতোষের আহ্বান কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারলেন না। অনেকে তাঁকে সরকারী চাকুরী ছেড়ে একাজে যোগদান করতে নিষেধ করলেন কিন্তু তিনি কারো কথাই শুনলেন না। ১৯১৭ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞানের পালিত-অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন।

তখন থেকে তিনি নিবিষ্টচিত্তে বিজ্ঞানের সেবায় মনোনিবেশ করলেন। ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগার তাঁর কাছে যেন নিজ গৃহের মত হয়ে উঠলো। সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত বিজ্ঞানের গবেষণায় ব্যাপৃত থেকে তিনি পদার্থ বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার করে বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে তুলতে লাগলেন।

কর্ম্ম, কর্ম্ম, কর্ম্মই তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। এই কর্ম্মদ্বারাই আজ বিজ্ঞান-জগতে তিনি একটী শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে নিয়েছেন। ১৯২৮ সালে বিজ্ঞান-জগতে তাঁর খ্যাতি খুব বেশিভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এই সময়ই তিনি "আলোক রশ্মির বিচ্ছুরণ" সম্বন্ধে অভিনব আবিষ্কার করেন। এ সম্বন্ধে তোমাদের পূর্ব্বে বলেছি। ১৯৩০ সালে রামন্ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

বর্ত্তমানে অবশ্য তিনি আর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নেই। জীবনের চরম খ্যাতি এখান থেকে অর্জ্জন করে, আজ তিনি তাঁর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেছেন। তিনি বর্ত্তমানে বাঙ্গালোর বিজ্ঞান-পরিষদের পরিচালকরূপে কাজ করছেন। সে কাজেও তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

তাঁর বয়স এখন মাত্র পঞ্চাশ। এখনও তাঁর যথেষ্ট কর্ম্ম-শক্তি রয়েছে। আশা করা যায় বিজ্ঞান-জগতে তিনি আরও অনেক নূতন দান করতে পারবেন।*

---

* আচার্য্য মেঘনাদ সাহার ইংরেজী ভাষায় লেখা একটী প্রবন্ধ থেকে অনেক সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে।

টেলিভিসন

(বেতারে ছবি পাঠানো)

কোয়েটায় ভূমিকম্প হয়ে সমস্তটা শহর একেবারে ধ্বংস হয়ে গেলো—বার্লিনের মাঠে ভারতীয় দলের সঙ্গে জারমান দলের হকি খেলা,—লণ্ডনে পার্ল্যামেণ্টের বক্তৃতা—এসবের যদি অবিকল চিত্র তোমরা মুহূর্ত্তের মধ্যে ঘরে বসে দেখ্‌তে পাও—তা হ'লে কি একেবারে অবাক্ হয়ে যাও না !

কথাটা শুনে অবধি তোমরা হয়ত মনে মনে ভাবছো এ-ও কি সম্ভব ! হ্যাঁ, এ-ও সম্ভব। দূর দূরান্তরের জিনিষ যাতে অতি সহজে ঘরে বসেই দেখা যেতে পারে তার উপায় বার করবার চেষ্টা মানুষ বহুকাল থেকেই করে আস্‌ছে। বিশেষ করে যে সব দূরের জিনিষ চোখের সাহায্যে দেখা সম্ভব নয়। এরই ফলে একদিন গ্যালিলিও আবিষ্কার করলেন দূরবীক্ষণ যন্ত্র। তারপর যখন মানুষ বিদ্যুতের শক্তি ব্যবহার করতে শিখ্‌লো তখন নানাভাবে মানুষ এর আরও উন্নতি নানারকমে করতে সুরু করলো। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে এব্‌বি ক্যাসেলি নামে একজন বৈজ্ঞানিক বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে তারের ভেতর দিয়ে নক্‌সা, ম্যাপ ইত্যাদি দূরে পাঠাবার একটা উপায় বার করেন। ক্রমে নানাজনে নানারকমে এর উন্নতি করেন।

টেলিভিসন

ইংরিজী ১৯০০ সাল পর্য্যন্ত বিনাতারে ছবি পাঠাবার কৌশল কেউই জানতো না। তখনই এ সম্বন্ধে আবিষ্কারের একটা সূচনা হয়। বিনাতারে ছবি পাঠাবার কথা শুনে তোমরা হয়ত সত্যি সত্যি একটু অবাকই হচ্ছ। কিন্তু এতে অবাক্ হ'বার কিছুই নেই—কারণ বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার ফলে আজ বহু অসম্ভব জিনিষ যেমন সম্ভবে পরিণত হয়েছে—তেমনি এ ব্যাপারটাও সম্ভব হয়েছে।

বিনাতারে যে টেলিগ্রাম পাঠানো যায় এ খবরটা নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে আজ আর অজানা নেই। এ কথাটা এখন আর কারো কাছে তেমন কিছু আশ্চর্য্য বলেও বোধহয় হয় না। বিনাতারে শুধু টেলিগ্রামই নয়—টেলিফোন—এমন কি বক্তৃতা, নাচ-গান, নাটক সব কিছুই পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে অতি অনায়াসেই পাঠানো চলে। লণ্ডন, নিউইয়র্ক, বা টোকিওতে বসে একজন বক্তৃতা করলে বা গান গাইলে, কলিকাতায় বসে তা আর একজন অনায়াসে উপভোগ করতে পারে। যে যন্ত্রের সাহায্যে এই আশ্চর্য্য কাণ্ড সাধিত হয়ে থাকে তাকে বলে রেডিও। রেডিও আজকাল সর্ব্বত্রই দেখা যায়। আজকাল রেডিওর গ্রাহক-যন্ত্রের দামও এত সস্তা হয়েছে যে, সাধারণ গৃহস্থেরাও ইচ্ছা করলে এর একটা কিনে নিতে পারে। পৃথিবীর প্রত্যেক

সুসভ্য দেশেই নিয়মিত ভাবে গান, বক্তৃতা, নাটক, সংবাদ প্রভৃতি বেতারে পাঠাবার ব্যবস্থা হয়েছে। সুতরাং একটা গ্রাহক-যন্ত্র থাকলে ঘরে বসে ঐ সব শুনে বেশ্ আনন্দ উপভোগ করা চলে।

বক্তৃতা, গান ইত্যাদি যে উপায়ে একদেশ থেকে আর এক দেশে পাঠানো যায়—ছবি পাঠাবার সময়ও সেই কৌশলই বহুল পরিমাণে অবলম্বন করা হয়। পার্থক্য শুধু যন্ত্রের মধ্যে। তোমাদের কাছে "আলোক-চিকিৎসা" গল্পে আমাদের চতুর্দ্দিক যে ইথারে পূর্ণ সে কথা বলেছি। ইথারের নানারকম ঢেউয়ে যে নানারকম কাণ্ড ঘটে থাকে, সে কথাও তোমরা ঐ গল্পেই শুনেছো। এই ইথারের মধ্যে আর এক রকম ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়ে থাকে—সেকথা তোমাদের কাছে অপ্রাসঙ্গিক বলে ঐ গল্পে বলিনি। এই ঢেউয়ের নাম বৈজ্ঞানিকেরা দিয়েছেন বেতারের ঢেউ (Wireless Waves). এই ঢেউয়ের সাহায্যেই গান, বক্তৃতা ও ফটোগ্রাফ ইত্যাদি একদেশ থেকে আর একদেশে পাঠানো হয়। কথাটা এখানে একটু বুঝিয়ে বলছি। পুকুরের জলে যদি একটা ঢিল ছুঁড়ে ফেল—তা হলে কি হয়? পুকুরের যে জায়গায় গিয়ে ঢিলটী পড়ে, সেখানকার জল ছিট্‌কে লাফিয়ে ওপরের দিকে ওঠে আর সঙ্গে সঙ্গেই ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। কেমন,

তাই নয় কি? এবং সেই ঢেউ গোল আকারে ভাস্‌তে ভাস্‌তে ক্রমে পুকুরের পারে গিয়ে বাঁধা পায়। এবং ভেঙ্গে বিলীন হয়ে যায়। এ ব্যাপারটা তোমরা অনেকেই হয়ত লক্ষ্য করে থাক্‌বে। আমাদের চতুর্দ্দিকে যে ইথার-সমুদ্র রয়েছে তার মধ্যে যদি বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গের সাহায্যে আঘাত করা যায় তা হ'লে সেখানেও ঐ রকম ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়—এবং সেই ঢেউগুলি গোল আকারে চারদিকে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ক্লার্ক ম্যাক্‌স্‌ওয়েল নামে একজন পণ্ডিত প্রমাণ করেন যে, বিদ্যুতের সাহায্যে ইথার সমুদ্রে তরঙ্গের সৃষ্টি করলে—সেই তরঙ্গ অতি দ্রুতবেগে অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল বেগে ছুট্‌তে পারে। গণিতের সাহায্যে এবং বিচারবুদ্ধিদ্বারা এই তত্ত্ব তিনি প্রমাণ করেন। এখানে বলে রাখা দরকার যে, এই তরঙ্গকেই বেতারে বার্ত্তা পাঠাবার বাহন রূপে ব্যবহার করা হয়। একেই বলে বেতারের ঢেউ (Wireless Waves)।

এর প্রায় কুড়ি বৎসর পরে সুপ্রসিদ্ধ জারমান পণ্ডিত হেনেরিস্‌ হার্ৎজ এই তত্ত্ব হাতে কলমে প্রমাণ করে দেন। তিনি এমনি একটী যন্ত্র আবিষ্কার করেন যার সাহায্যে ইথার সমুদ্রে তরঙ্গের সৃষ্টি করা চলে। এর সাহায্যে শুধু

হার্জ

মার্কনি
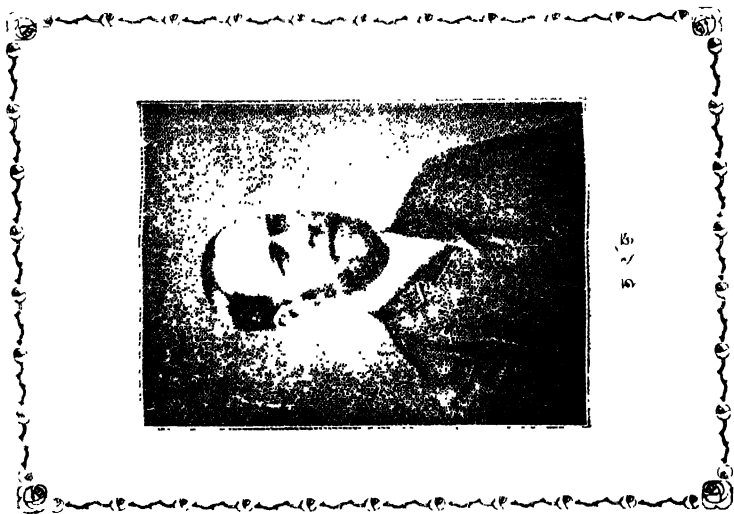
তরঙ্গের সৃষ্টি করাই চলে না—ইথার সমুদ্রের মধ্যে যে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে তা-ও বেশ্ বোঝা যায়। হার্ৎজের এই যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে সবাই বুঝ্লে যে, ম্যাক্স্ওয়েলের আবিষ্কৃত তত্ত্ব শুধু মুখের কথা নয়—এ একেবারে খাঁটী সত্য। বেতারে বার্ত্তা প্রেরণ করবার কৌশল আবিষ্কারের এইখানেই সূত্রপাত হলো।

বিদ্যুতের সাহায্যে ইথারের মধ্যে যে তরঙ্গের সৃষ্টি করা হয়, তা পুকুরের জলে ঢিল ছুঁড়লে যে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়—অনেকটা সেই রকম। কিন্তু পুকুরের জলের ঢেউ খুব বেশী দ্রুত চল্‌তে পারে না। কিন্তু ইথার তরঙ্গের বেগ খুব বেশী। একথা পূর্ব্বেই তোমাদের বলেছি। হার্ৎজের আবিষ্কৃত যন্ত্রের একটু খুঁৎ ছিল। এই যন্ত্রের সাহায্যে ইথার সমুদ্রে তরঙ্গের সৃষ্টি করে, দূরে বসে যদি সত্যি সত্যি সেখানে ঢেউ উঠেছে কি না তা পরীক্ষা করতে যাওয়া যায় তা হলে তা সম্ভব হয় না। সুতরাং হার্ৎজের আবিষ্কার এই দিক দিয়ে বিশেষ সফল হলো না।

এর পর সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী বৈজ্ঞানিক ব্রান্লী, ইংরেজ বৈজ্ঞানিক স্যার অলিভার লজ, আর আমাদেরই বাংলা মায়ের কৃতী সন্তান স্যার জগদীশচন্দ্র বসু, হার্ৎজের আবিষ্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে নানারকম পরীক্ষা সুরু করলেন। ইথার সমুদ্রে

তরঙ্গের সৃষ্টি করলে, দূরে বসে কি ভাবে তা বোঝা যেতে পারে তারই উপায় উদ্ভাবন করবার জন্য তাঁরা চেষ্টা আরম্ভ করলেন। এবং তাঁরা কৃতকার্য্যও হলেন। তাঁরা ঐ কাজের উপযোগী যন্ত্র আবিষ্কারও করতে সক্ষম হলেন। এই যন্ত্রকে বলে কোহেরার (Coherer) বা সংযোজক যন্ত্র। এই যন্ত্র আবিষ্কারের ফলেই ইথার তরঙ্গের সাহায্যে বার্ত্তা প্রেরণের কাজ অনেকটা এগিয়ে এলো।

এই সমস্ত আবিষ্কারের সূত্র অবলম্বন করে সিগ্নর মারকনি নামে একজন ইতালীয় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করতে গিয়ে, ইথার তরঙ্গের অদ্ভুত শক্তির কথা প্রথম অবগত হন। তিনি একে কি করে মানুষের প্রয়োজনীয় কাজে লাগানো যায় তার উপায় উদ্ভাবন করবার জন্য গবেষণা আরম্ভ করেন। পরীক্ষা করে, তিনি বুঝ্তে পারলেন যে, ইথারের মধ্যে ঢেউয়ের সৃষ্টি করে, ইচ্ছা করলে তারই সাহায্যে সংবাদ পর্য্যন্ত প্রেরণ করা সম্ভব হতে পারে। তিনি এই কথা ভেবেই—একটা নূতন আবিষ্কারের আশায় মত্ত হয়ে উঠ্লেন। পরীক্ষা করতে করতে মারকনি বুঝলেন যে, তাঁর পূর্ব্বে যে সমস্ত আবিষ্কার হয়েছে, সে কৌশলে ইথার তরঙ্গ খুব বেশী দূরে পাঠানো সম্ভব নয়। এরই মধ্যে আর একটা আবিষ্কার হওয়ায় মারকনির কাজ অনেকটা সহজ হয়ে

এলো। সুপ্রসিদ্ধ রাশিয়ান পদার্থবিদ্যাবিদ্ পণ্ডিত পপ্ভও এইসব বিষয় নিয়ে গবেষণা সুরু করেছিলেন। তিনি একটী উঁচু মাস্তলের সাহায্যে ইথার সমুদ্রে বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের আঘাত করে, তরঙ্গের সৃষ্টি করে, তাকে দূরে প্রেরণ ও গ্রহণ করবার কৌশল আবিষ্কার করেন। এই উপায়ে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি তিন মাইল দূরে সঙ্কেত প্রেরণ ও গ্রহণ করেন। ১৮৯৭ সালে মারকনি এর অনেক উন্নতি করে, প্রায় আঠার মাইল দূরে সঙ্কেত প্রেরণ ও গ্রহণ করেন।

আজকাল যত সহজে এই যন্ত্রের সাহায্যে বক্তৃতা, গান ইত্যাদি এক জায়গা থেকে পাঠানো যায় ও আর এক জায়গায় বসে গ্রহণ করা চলে, প্রথম অবস্থায় এই যন্ত্রের সাহায্যে এত সহজে তা সম্ভব হতো না। এই যন্ত্রকে বর্ত্তমান অবস্থার মত কার্য্যকরী করে তুল্‌তে বহু বৈজ্ঞানিক বহু বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তারই ফলে আজ মানুষ এক জায়গায় বসে দূরদূরান্তরের কথা, গান, বক্তৃতা ইত্যাদি অতি অনায়াসে শুন্‌তে পার্‌ছে।

যে যন্ত্রের সাহায্যে কথাবার্ত্তা এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় পাঠানো হয়, তাকে বলে প্রেরক-যন্ত্র (Transmitter) আর যে যন্ত্রের সাহায্যে কথাবার্ত্তা গ্রহণ করা হয়, তাকে বলে গ্রাহক-যন্ত্র (Receiver)। প্রেরক-যন্ত্রের একটী

অংশকে বলে মাইক্রোফোন (Microphone)। এরই সামনে মুখ রেখে কথা বলা হয়। এই যন্ত্রের সাম্‌নে মুখ রেখে কথা বলা মাত্র শক্তিশালী বিদ্যুৎ-প্রবাহের সাহায্যে ইথার সমুদ্রে ঢেউয়ের সৃষ্টি করে, ঐ শব্দকে তার সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়। তারপর ঐ শব্দ ঢেউকে অবলম্বন করে দ্রুতগতিতে চলতে থাকে। যেখানে শব্দ-গ্রাহক যন্ত্র আছে সেখানে গিয়ে এই ইথার তরঙ্গ আঘাত করে। এবং যারা সেখানে থাকে তারা ঐ শব্দ শুন্‌তে পারে। এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলা যায়, কিন্তু সব কথা তোমাদের পক্ষে এখন বোঝা সম্ভব হবে না বলেই তা থেকে বিরত হ'লাম। তোমরা বড় হয়ে বিষয়গুলি পড়ে দেখো, ভারী আমোদ পাবে।

বিনাতারে যেমন সংবাদ, বক্তৃতা, গান ইত্যাদি পাঠানো চলে তেমনি বিনাতারে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় কোন দৃশ্য বা মানুষের চিত্রও পাঠানো যেতে পারে। এই যন্ত্রেরও আজকাল খুবই উন্নতি হয়েছে। শুধু একটা মানুষের চিত্রই যে এ যন্ত্রের সাহায্যে পাঠানো চলে তা নয়। ইচ্ছা করলে, একটা সম্পূর্ণ নাটকের সুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত, বা একটা ক্রিকেট বা ফুটবল ম্যাচ বা যুদ্ধ-ক্ষেত্রের ছবি বা ঐ রকম আরও কিছুর হুবহু প্রতিলিপি বেতারে একদেশ থেকে অপর দেশে পাঠানো যায়।

আজকাল আরও সুবিধা করা হয়েছে—ইচ্ছা করলে কথাবার্ত্তাও সেই ফটোর সঙ্গে সঙ্গেই পাঠিয়ে দেওয়া চলে"। ধর, লণ্ডনে আলহাম্‌রা থিয়েটার হলে একটা নাটক হচ্ছে—সেই নাটক তোমরা কলিকাতায় বসে ইচ্ছা করলে পর্দ্দার গায় প্রতিফলিত দেখ্‌তে পার এবং সঙ্গে সঙ্গে গান, অভিনয় সবই শুন্‌তে পার। ঠিক যেমন তোমরা চলচ্চিত্রে সবাক ছবি দেখতে পাও। এ যন্ত্রেরও ক্রমেই এতটা উন্নতি হচ্ছে যে—আশা করা যায় এই যন্ত্রের সাহায্যে একদিন এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের যে দূরত্বের ব্যবধান আছে তা আর থাকবে না।

কি করে বেতারে চিত্র পাঠাতে হয় সে কথা জান্‌বার জন্য তোমাদের হয়ত খুবই কৌতূহল হচ্ছে। সেই সম্বন্ধেই সংক্ষেপে তোমাদের বল্‌ছি; কারণ বিষয়টা অত্যন্ত জটীল বলে, তোমরা সব কথা এ বয়সে হয়ত বুঝ্‌বে না। চলচ্চিত্রে কি করে চলন্ত ছবি দেখানো হয় তা তোমরা হয়ত জানো না। ধর, যেমন চলচ্চিত্রে দেখানো হবে একজন মানুষ একটা গাড়ীতে উঠ্‌ছে। এ অবস্থার চিত্র দেখাতে হলে, এই গাড়ীতে ওঠ্‌বার বিভিন্ন অবস্থার অনেকগুলো ফটোগ্রাফ তোলা হয়। এই একটা সামান্য ব্যাপারেরই হয়ত কুড়ি পঁচিশটা ছবি তুলে নেওয়া হলো। এক এক অবস্থার এক একটা।

লোকটী একটু এগিয়ে গেলো, তারপর গাড়ীর দরজা খুল্‌লো, তারপর গাড়ীর পাদানির ওপরে পা রাখ্‌লো, তারপর ভেতরে ঢুক্‌লো, তারপর বস্‌লো—এই রকম সব। এই বিভিন্ন অবস্থার ছবিগুলো তুলে নিয়ে, একটা যন্ত্র-শক্তি বলে খুব জোরে জোরে ঘুরিয়ে যদি আলোকের সাহায্যে ছবিগুলোকে পর্দ্দার গায়ে প্রতিফলিত করা যায়, ও সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরিয়ে যাওয়া যায়, তা হলে মনে হবে যেন আমরা একটা মানুষকে একেবারে গাড়ীতেই উঠ্‌তে দেখ্‌ছি। ঐ ভাবে বিভিন্ন অবস্থার ছবিগুলো ভিন্ন ভিন্ন আর আমরা দেখ্‌তে পাই না। কারণ একটার পর আর একটা চিত্র ছুটে এসে আমাদের চোখে একেবারে ধাঁধাঁ লাগিয়ে দেয়। আচ্ছা, আরও একটু সহজ করে বলি, একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে যদি খুব জোরে গোল আকারে ঘোরাও তা হলে কি মনে হয়? মনে হয় না কি যে, একটা গোল আগুনের রেখা দেখা যাচ্ছে। এইভাবেই আমাদের চোখ একটা সম্পূর্ণ ঘটনাকে গ্রহণ করে থাকে। গতি আছে বলে আমাদের চোখ এর বিভিন্ন অংশ পৃথক পৃথক করে আর দেখ্‌তে পায় না—দেখে একেবারে সম্পূর্ণ ঘটনাটা। চলচ্চিত্রও এই নিয়মেই চলে।

বেতারে চিত্র প্রেরণ করবার কৌশল আবিষ্কার করবার পূর্ব্বে এই রকম একটা কথাই মানুষের মনে প্রথম সাড়া জাগিয়ে তুলেছিল। মানুষ ভাবলে, একটা দৃশ্যের ছবি পাঠাতে হলে, একে ছোট ছোট করে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে না নিয়ে, সম্পূর্ণ দৃশ্য এক সঙ্গে পাঠানো সম্ভব হবে না। এই কথা ভেবেই মানুষ এর কৌশল আবিষ্কারের চেষ্টায় মনোনিবেশ করলো। সুপ্রসিদ্ধ স্কচ্ বৈজ্ঞানিক জে. এল. বেয়ার্ড এ সম্বন্ধে গবেষণা করে করে এর একটা পন্থাও আবিষ্কার করলেন।

তিনি বার করলেন একটা দৃশ্যকে যদি কোন ক্রমে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে, তাকে বিদ্যুতে পরিণত করে নেওয়া যায়, তা হলে বেতারের ঢেউয়ের সাহায্যে এই বিদ্যুতকে অনায়াসে একদেশ থেকে অপর দেশে পাঠানো চলে। এই কাজের জন্য একটা যন্ত্রও তিনি তৈরী করে ফেল্‌লেন। অবশ্য আজকাল এ যন্ত্রের যতটা উন্নতি হয়েছে প্রথম অবস্থায় এ যন্ত্র ততটা উন্নত ছিল না। আজকাল যে রকম যন্ত্রের সাহায্যে চিত্র পাঠানো হয় সে যন্ত্রের কথাই তোমাদের বল্‌বো, কারণ প্রথম দিককার যন্ত্রের কথা বলে লাভও নেই—আর কিরূপে এ যন্ত্রের নানাভাবে উন্নতি করা

হয়েছে সে বিষয়ে বেশী কিছু বলা চল্‌বেও না—কারণ খিষয়টা ভারী শক্ত।

কথাবার্ত্তা পাঠাতে হলে প্রেরক যন্ত্রের মাইক্রোফোনের সামনে মুখ রেখে যেমন কথা বল্‌তে হয় তেমনি যে মানুষের বা দৃশ্যের চিত্র বেতারে পাঠাতে হবে—তা'দিগেও ঐ রকম একটা যন্ত্রের অতি সামনে নিয়ে রাখ্‌তে হয়। তারপর বেতারে পাঠাবার মানুষ বা দৃশ্যকে এক আশ্চর্য্য কৌশল অবলম্বন করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে নিয়ে বিদ্যুতান্নুতে পরিণত করে, বেতারের ঢেউয়ের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। এলুমিনিয়ম ধাতুর নির্ম্মিত কুড়ি ইঞ্চি ব্যাস-বিশিষ্ট একটা চাকা এই কাজের জন্য আজকাল ব্যবহার করা হচ্ছে। এই চাকাতে ত্রিশটী ছোট ছোট চতুষ্কোণ ফুটো আছে। প্রত্যেকটী ফুটোর প্রত্যেকটী পাশ এক ইঞ্চির ত্রিশ ভাগের একভাগ লম্বা। এই ফুটোগুলো চাকাটীর পরিধি বেষ্টন করে গোলাকারে সাজানো। যে দিক থেকে বেতারে দৃশ্য পাঠানো হয়, সেদিকে খুব তীব্র উজ্জ্বল একটা আলোক রাখা হয়। এই আলোকটী অনেকটা ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণেরই মত। এই আলোকের সামনেই থাকে ঐ এলুমিনিয়মের চাকাটী। এই চাকার পেছনে আবার একটী আরশী জাতীয় বড় একখণ্ড কাচ রাখা হয়। এর উদ্দেশ্য চাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ

ছিদ্রের ভেতর দিয়ে যে আলো বেরিয়ে আস্‌বে তাকে কেন্দ্রীভূত করে নেওয়া। যে মানুষ বা দৃশ্যের ছবি বেতারে পাঠাতে হবে তা থাকে এরই পেছনে। এই চাকার ফুটো-গুলো আবার বেশ্‌ একটু কৌশল করে সাজানো। চাকাটীর পরিধি বেষ্টন করে এগুলো এমনিভাবে সাজানো থাকে, যে একটা ফুটো আর একটা ফুটোর চেয়ে চাকার কেন্দ্রস্থলের নিকটবর্ত্তী। এই চাকাটী অতি দ্রুতগতিতে ইলেকট্রিক মোটরের সাহায্যে ঘোরাণ হয়। চাকাটী মিনিটে প্রায় সাত শত পঞ্চাশ বার ঘোরে। এর ফলে ঐ তীব্র উজ্জ্বল আলোক বিন্দু বিন্দু করে চাকার ফুটোগুলোর ভেতর দিয়ে গিয়ে আরশীতে কেন্দ্রীভূত হয়ে, বেতারে যে মানুষ বা দৃশ্যের চিত্র পাঠানো হবে, তারই ওপরে পড়ে প্রতিফলিত হয় এবং সম্মুখে অবস্থিত আর একটী যন্ত্রের ওপরে গিয়ে পড়ে। এই যন্ত্রটীকে বলে ফটো ইলেকট্রিক সেল্‌ (Photo Electric Cell)। এই যন্ত্রটীও খুবই আশ্চর্য্য। এ যন্ত্রের বিষয়ও সব কথা তোমরা বুঝ্‌বে না। তবে সংক্ষেপে বল্‌ছি এই থেকেই বুঝে নিও। এই যন্ত্রের মধ্যে যখন প্রতিফলিত আলোক-রেখা বিন্দু বিন্দু করে পড়তে থাকে তখনই সঙ্গে সঙ্গে সেখানে এক অদ্ভুত কাণ্ড আপনা থেকেই সৃষ্টি হয়ে পড়ে। আলোকবিন্দু পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ যন্ত্রের

মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই যন্ত্রের মধ্যে কি করে বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি হয় তা বল্‌ছি। প্রত্যেক ধাতুর ধর্ম্মই হচ্ছে এই, যে, যদি তার ওপরে আলো পড়ে তা হ'লে তা থেকে সামান্য পরিমাণ বিদ্যুতানু ছুটে বেরোয়। বিদ্যুতানু কাকে বলে সে কথা রেডিয়মের গল্পে তোমাদের কাছে বলেছি। পটাসিয়ম ও সোডিয়ম প্রভৃতি ধাতুর ওপরে আলোক পড়লে তা থেকে বিদ্যুতানু একেবারে স্রোতের আকারে বইতে থাকে। ফটো ইলেকট্রিক সেলের মধ্যেও এই রকম একটী ধাতু থাকে। এই রকম যন্ত্রের ওপরে আলোক পড়বামাত্র তা থেকে বিদ্যুতের ক্ষীণ স্রোত বইতে আরম্ভ করে।

আলোক-বিন্দুর প্রতিফলনের কম বেশীর ওপরে বিদ্যুৎ-প্রবাহ সৃষ্টির এবং তার শক্তির কম বা বেশী হওয়া নির্ভর করে। "আকাশ কেন নীল?" গল্পে তোমাদের কাছে আলোকের প্রতিফলন সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছি। কালো চুল অপেক্ষা সাদা দাঁত থেকে বেশী আলোক প্রতিফলিত হয়। কেন এমন হয় সেকথা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝ্‌তে পার। এই কারণেই ফটো ইলেকট্রিক সেলের ভেতর যে বিদ্যুৎ সৃষ্টি হয় তার প্রবাহও এক এক সময় এক এক রকম শক্তি সম্পন্ন হয়। সুতরাং মানুষ বা দৃশ্যের চিত্র

বেতারে চিত্র প্রেরিত হইতেছে
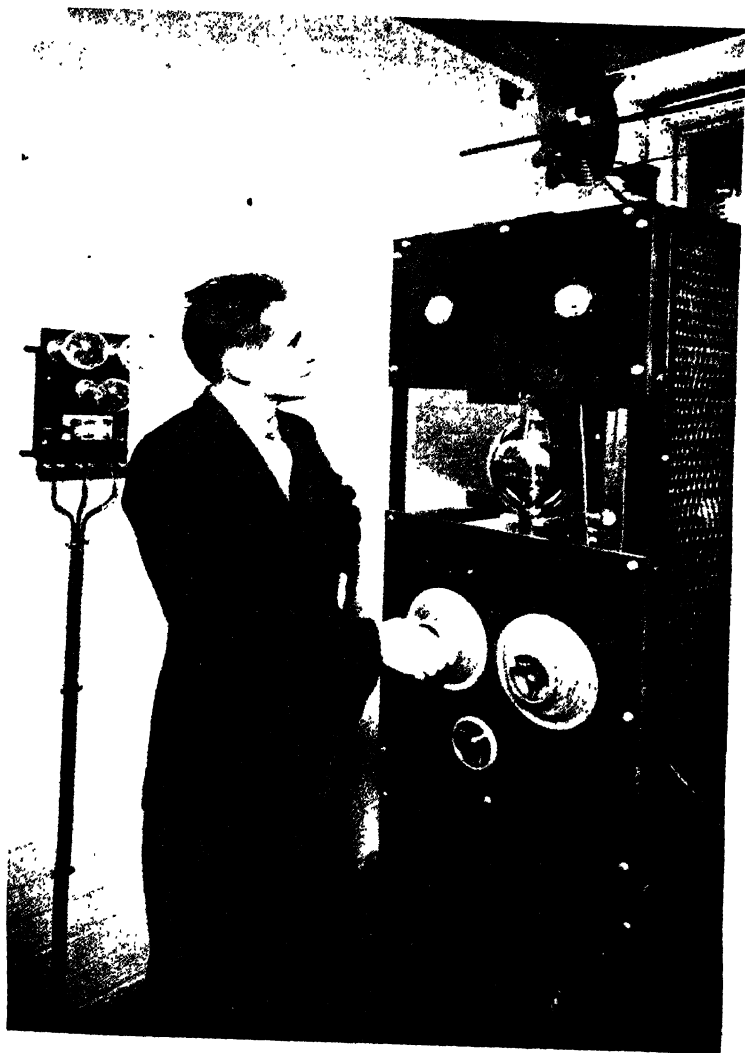
অস্পষ্ট হতে পারে না। যেখানে যেমনটী হওয়া প্রয়োজন তেমনই হয়। এই জন্য বেতারে পাঠানো ছবি স্পষ্ট বোঝাও যায়, নইলে সমস্তটা দৃশ্য বা চেহারা একই রকম হয়ে আমাদের কাছে অস্পষ্ট হয়ে পড়তো। তারপর এই ক্ষীণ বিদ্যুতের স্রোতে পরিবর্ত্তিত বিন্দু বিন্দু আলোক-রেখাকে আর একরকম যন্ত্রের সাহায্যে বিশেষ শক্তিশালী করে, ইথার সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। এই ঢেউ ভাস্‌তে ভাস্‌তে ঐ বিদ্যুতবিন্দুগুলোকে নিয়ে চল্‌তে থাকে। যেখানে এই ফটো গ্রহণ করা হবে, সেখানেও অনুরূপ গ্রাহক-যন্ত্র আছে। এবং চিত্র প্রতিফলিত হওয়ার জন্য সেখানে এই যন্ত্রের সঙ্গে একটা পর্দ্দাও থাকে।

সেখানেও ঐ রকম ফুটো-বিশিষ্ট একটী চাকা আছে। ঐ চাকাটীকে প্রেরক-যন্ত্রের চাকার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একই গতিতে চালানো হয়। এই যন্ত্রের চাকাও প্রেরক যন্ত্রের চাকার মতই ইলেকট্রিক মোটরের সাহায্যে চালানো হয়। বায়স্কোপের ছবির মত এই যন্ত্রের সঙ্গে যে পর্দ্দা থাকে তার ওপরে এসে সমস্ত চিত্রটী প্রতিফলিত হতে থাকে।

একটী চাকার সাহায্যে ভাগে ভাগে কোন একটী বড় দৃশ্যের ছবি পাঠাতে হলে, এই চাকার মধ্যে যত বেশি ফুটো থাকবে ছবিটীও মূল দৃশ্যের ততই অবিকল প্রতিলিপি

হবে। কিন্তু চাকার মধ্যে বেশি ফুটো করতে হলে চাকাটী আবার বড় করে তৈরী করতে হয়। বড় চাকা সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করার অনেক অসুবিধা আছে। এই কারণে কোন বড় দৃশ্যের ছবি তুলতে হ'লে, কয়েকটী যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এবং সম্পূর্ণ দৃশ্যটী পৃথক পৃথক অংশে পাঠানো ও গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়া আরও কয়েকটী উপায়েও ছবি পাঠাবার কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে।

এখনও ছবি পাঠাবার কৌশলটি খুব নিখুঁত অবস্থায় এসে পৌঁছয় নি। তবে এ সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা যে ভাবে গবেষণা আরম্ভ করেছেন—তাতে মনে হয় কালে এর খুবই উন্নতি হবে।

বেতারে সবাক্ এবং নির্ব্বাক্ উভয় রকম চলচ্চিত্রই পাঠানো যেতে পারে। ইউরোপ ও এমেরিকায় এ শ্রেণীর সবাক্ ও নির্ব্বাক্ চিত্রের খুব প্রচলন আরম্ভ হয়েছে।

ভারতবর্ষেও এইরূপে ছবি দেখাবার চেষ্টা হচ্ছে। শীগ্‌গীরই হয়ত কলিকাতায় বা দিল্লীতে এর একটা ব্যবস্থা হওয়া অসম্ভব নয়।

আইনষ্টাইন

(আপেক্ষিক তত্ত্ব)

প্যারিসের একটা রেস্তোঁরায় বসে একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক অতি বিষণ্ণভাবে আকুল নয়নে চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি যেন খুঁজছেন। তাঁর মুখে-চোখে ফুটে উঠেছে একটা ব্যাকুলতার ভাব। ঐ রকম ভাবে রেস্তোঁরার মধ্যে বসে চারদিকে আকুল নয়নে তাঁকে দৃষ্টিপাত করতে দেখে, বাইরে থেকে তারই পরিচিত একজন ভদ্রলোক কৌতূহলী হয়ে, রেস্তোঁরার মধ্যে প্রবেশ করে, তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হলেন এবং অতি সম্মানের সঙ্গে তাঁকে অভিবাদন করলেন। ভদ্রলোক আগন্তুককে পেয়ে যেন একেবারে অকূল সাগরে কূল পেলেন। তিনি তাঁকে বল্‌লেন—"বসুন।" আগন্তুক পাশেরই একটা চেয়ারে উপবেশন করে, তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—"কবে এলেন প্যারিসে। তারপর এখানেই বা বসে রয়েছেন কেন? কারও জন্য অপেক্ষা করছেন কি? ভদ্রলোক ব্যস্ত সমস্ত হয়ে উত্তর করলেন, "আজই আমি এসেছি। কারও জন্য এখানে অপেক্ষা করছি না। আমি একটু বিপদে পড়ে গেছি। আপনি অনুগ্রহ করে আমায় যদি সাহায্য না করেন—তা হলে আমি ভারী মুস্কিলেই পড়্‌বো।" মুখে-চোখে

আবার তাঁর ফুটে উঠ্‌লো একটা দারুণ অসহায়ের ভাব।

উত্তরে আগন্তুক ভদ্রলোক বল্‌লেন—"মুস্কিল! আপনার মত লোক—পৃথিবী জোড়া যাঁর খ্যাতি—তাঁর আবার কি মুস্কিল হতে পারে। বলুন—কী সে ব্যাপার। আমি প্রাণপণ করে আপনাকে সাহায্য করবো। আপনার মত লোককে সাহায্য করতে পারলে—পৃথিবীর যে কোন লোক নিজকে ধন্য মনে করবে।" ভদ্রলোক বল্লেন—"আমি যে হোটেলে এসে উঠেছি—সেটী খুঁজে পাচ্ছি না।"

আগন্তুক ভদ্রলোক একটু হেসে বল্‌লেন—"এই মুস্কিল! সে হোটেলটীর কি নাম বলুন ত। আমি এখনই পথ দেখিয়ে আপনাকে সেখানে নিয়ে পৌঁছে দিচ্ছি।"

ভদ্রলোক বল্লেন—"হোটেলের নাম ত জানি না। সেখানটয়াই ত বিপদ। সে জানেন আমার স্ত্রী। তিনিও সেই হোটেলেই আছেন।"

এই আপনভোলা লোকটীর কথা শুনে আগন্তুক ভদ্রলোক বিস্ময়ে একেবারে অবাক্ হয়ে গেলেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন, এমন লোকও এ যুগে দুনিয়ায় আছে যিনি এই বিদেশ-বিঁভূয়ে কোথায় এসে উঠ্‌লেন, তার নামটী জান্‌বার পর্য্যন্ত প্রয়োজন অনুভব করেন না।

আইনষ্টাইন

যাক্ তিনি তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বল্‌লেন,—"আপনার কোন চিন্তা নেই। আপনি এখানে বসুন। আমি এক্ষুণি আপনার হোটেল খুঁজে বার করছি।"

এই কথা বলেই ভদ্রলোক রেস্তোঁরা থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তার মোড়ে দাঁড়ান একজন পুলিশ কর্ম্মচারীকে বল্‌লেন—, "আপনি এখনই একটু টেলিফোন করে, পুলিশ আফিস থেকে জানুন ত মিষ্টার আইনষ্টাইন কোন্ হোটেলে এসে উঠেছেন।" বিদেশ থেকে যারা আসে, পুলিশ আফিসে তাদের প্রত্যেকের নাম, কোথায় তারা থাক্‌বে সব লেখা থাকে।

পুলিশ কর্ম্মচারিটী ঐ ভদ্রলোককে প্রশ্ন করলেন—"কেন আপনি তাঁর ঠিকানা জান্‌তে চান, বল্‌বেন কি?"

তিনি বল্‌লেন—"আরে সে এক মজার ব্যাপার! ঐ যে দেখুন, মিষ্টার আইনষ্টাইন ঐ রেস্তোঁরায় বসে রয়েছেন। 'তিনি বল্‌লেন—তিনি কোথায় এসে উঠেছেন তা বল্‌তে পারেন না'।"

পুলিশ কর্ম্মচারিটী—এ ব্যাপারটা শুনে অবাক্ হয়ে মনে মনে ভাব্‌লে—লোকটা কি পাগল না কি? কোথায় এসে উঠেছে তা-ই বল্‌তে পারে না!

যাক্ সে টেলিফোন করলে পুলিশ আফিসে। সেখান থেকে খবর এলো—"মিষ্টার আইনষ্টাইন উঠেছেন 'হোটেল

ডি লুভারে'।" টেলিফোনের উত্তর পেয়ে, পুলিশ কর্ম্মচারিটী ঐ ভদ্রলোককে বল্‌লেন—"মিষ্টার আইনষ্টাইন যেখানে উঠেছেন—ঐ ত সেই 'হোটেল ডি লুভার'।" এই বলেই বিপরীত দিকের একটা বড় বাড়ী দেখিয়ে দিলে। অবাক্ কাণ্ড! আইনষ্টাইন রেস্তোঁরায় বসে সেই বাড়ীটার দিকেই তাকিয়ে আছেন প্রায় আধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত! অথচ ঐখানেই যে তিনি এসে উঠেছেন তা-ই তাঁর খেয়াল নেই।

যাক্ রাস্তা অতিক্রম করে ত তাঁকে হোটেলে পৌঁছে দেওয়া হলো। পথ চল্‌তে চল্‌তে তিনি বল্‌তে লাগ্‌লেন—"কী ব্যাপার—কথা বল্‌তে বল্‌তে যে রাস্তা পেরিয়ে এপারে এসে পড়েছিলাম তা-ই মনে নেই।

এদিকে হোটেলে আর এক কাণ্ড। আইনষ্টাইনের স্ত্রী—শিশুর মত সরল আর দার্শনিকেরই মত খেয়াল-ভোলা তাঁর স্বামীটীকে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ফিরতে না দেখে, ভারী চিন্তিত হয়ে পড়্‌লেন। তিনি নানা রকম আশঙ্কাই করতে লাগলেন। এদিকে তাদের আরং এক জায়গায় নিমন্ত্রণে যাবারও সময় হয়ে এলো। সুতরাং তিনি বিলম্ব করা উচিত নয় ভেবে স্বামীকে খুঁজতে লোকজন নিয়ে পথে বেরুবেন বলে স্থির করলেন। তিনি বেরুতে যাবেন ঠিক এমনি সময় তাঁর স্বামী এসে উপস্থিত। তাঁকে নিরাপদে

ফিরতে দেখে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্লেন। এবং বিলম্বের কারণ শুনে যে ভদ্রলোকটী তাঁর স্বামীকে এনে পৌঁছে দিয়েছেন তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলেন।*

এই যে শিশুর মত সরল আর দার্শনিকের মত খেয়াল-ভোলা মিষ্টার আইনষ্টাইন এঁর নাম তোমরা শুনেছ কি? এঁর সম্পূর্ণ নাম আলবার্ট আইনষ্টাইন। "ইনিই এ যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক"—অনেক খ্যাতনামা মনীষী এই মত প্রকাশ করেছেন।

ইনি পদার্থ-বিজ্ঞানের যে নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন—সে তত্ত্ব অতি অভিনব। তাঁর এই আবিষ্ক্রিয়ার ফলে, বিজ্ঞান-জগতে এক বিপ্লবের সূচনা হয়েছে। এবং বৈজ্ঞানিকদের গতি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কতকগুলো পুরোণো বিশ্বাসের পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করতে হয়েছে। এঁর আবিষ্কৃত এই তত্ত্বের নাম আপেক্ষিক তত্ত্ব (Theory of Relativity)। তাঁর আবিষ্কৃত এই আপেক্ষিক-তত্ত্বকে ভিত্তি করে আজ নূতন গতি-বিজ্ঞানের বনিয়াদ গড়ে উঠেছে।

গতি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন কথা বল্‌তে হলে প্রথমেই আমাদের বল্‌তে হয়—গতি ব্যাপারটী হচ্ছে আপেক্ষিক

* পিয়ের ভ্যান্ পাসেন নামে এক ভদ্রলোক, আমেরিকার কোন পত্রিকায় এই গল্পটী লিখেছিলেন। তিনিই আইনষ্টাইনকে পৌঁছে দেন।

(Relative)। আপেক্ষিক কথাটা তোমরা হয়ত বুঝ্‌তে পারলে না। এই কথাটাই বুঝিয়ে বল্‌ছি।

প্রতি নিয়তই যে আমরা একটা গতির ভেতর দিয়ে চলেছি সেকথা কিন্তু আমরা একেবারেই টের পাই না। আমরা যে গতির ভেতর দিয়ে কেমন ভাবে চলেছি—তা হয়ত তোমরা বুঝ্‌তে পেরেছ। পূর্ব্বে গ্যালিলিওর গল্পেই এ কথাটা তোমরা পড়েছো। তিনি আবিষ্কার করেছিলেন যে—পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে প্রতি নিয়তই ঘূরছে এবং তারই ফলে দিন ও রাত্রি হচ্ছে। গোটা পৃথিবীটাই যখন ঘূরছে তখন সঙ্গে সঙ্গে আমরাও নিশ্চয়ই ঘূরছি। কেমন তাই নয় কি। আচ্ছা তা-ই যদি হয়, তাহলে আমরা সে ব্যাপারটা মাত্রই টের পাই না কেন—অথচ পৃথিবী যে ঘূরছে একথা সত্যি। কেন আমরা এ ব্যাপারটা টের পাই না—তা হয়ত তোমরা নিশ্চয়ই জানো না। সে কথাটাই তোমাদের বল্‌ছি। কারণ পৃথিবীর এই ঘূরবার ব্যাপারটা তুলনা করবার মত কোন কিছুই আমরা আমাদের চতুর্দ্দিকে দেখ্‌তে পাই না। পৃথিবী যেমন ঘোরে তেমনি তার সঙ্গে সঙ্গে একই গতিতে পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই ঘোরে সুতরাং কারোই বোঝ্‌বার উপায় থাকে না—কে ঘূরছে আর কে ঘূরছে না।

একেই বলে আপেক্ষিক অর্থাৎ একের সঙ্গে অপর সম্পর্ক বিশিষ্ট।

গতি বিজ্ঞান নিয়ে পণ্ডিতেরা বহুকাল থেকেই নানা রকম গবেষণা করে আস্‌ছেন এবং এ সম্বন্ধে বহু নূতন তত্ত্ব তাঁরা আবিষ্কারও করেছেন। পূর্ব্বে তোমাদের গ্যালিলিওর গল্পে বলেছি যে, এরিষ্টটল নামে একজন পণ্ডিত মত প্রকাশ করেন যে, কোন উঁচু জায়গা থেকে যদি ভারী ও পাত্‌লা হ'টো জিনিষ একসঙ্গে ফেলে দেওয়া যায়, তা হলে ভারী জিনিষটাই প্রথম মাটী স্পর্শ করে। কিন্তু গ্যালিলিও প্রমাণ করলেন যে, এ সিদ্ধান্ত ভুল। কোন উঁচু জায়গা থেকে ভারী ও পাত্‌লা হুটো জিনিষ ফেলে দিলে, তা একই সময় মাটী স্পর্শ করবে, যদি যে যায়গা দিয়ে ঐ জিনিষ হ'টো এসে পড়বে, সেই পথের বায়ুর চাপ সর্ব্বত্রই সমান থাকে। এরপর নিউটন বায়ুর গতি সম্বন্ধে কতকগুলো নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। নিউটন মাধ্যাকর্ষণ এবং মহাকর্ষণের কথাও আবিষ্কার করেন। তিনি বলেছিঁলেন যে, প্রত্যেক জিনিষের গতি-বেগ প্রত্যেক জিনিষ দ্বারা সকল সময়ই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এ সব কথাই পূর্ব্বে তোমাদের বলেছি। কিন্তু এই গতি-বিজ্ঞান বিষয়েই আইনষ্টাইনের আবিষ্কৃত "আপেক্ষিক তত্ত্ব" অতি অভিনব। এই আপেক্ষিক তত্ত্বের কথাই এখন তোমাদের বল্‌বো।

চিরকালই মানুষের বিশ্বাস দূরত্ব বা পার্থক্য, পদার্থের মাত্রা বা জড়মান এবং সময়ের মূল্য বা পরিমাণের কখনও হ্রাস বা বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আইনষ্টাইন পরীক্ষাদ্বারা নির্ভুল ভাবে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, এ ধারণা একেবারেই ভুল। কোন দূরত্ব বা পার্থক্য, পদার্থের মাত্রা বা জড়মান এবং সময়ের মূল্য বা পরিমাণের হ্রাস বা বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব। এবং গতির সঙ্গে এর একটা বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। দুইটী গাছের মধ্যে যদি পনর হাত দূরত্ব বা পার্থক্য থাকে—তবে প্রত্যেক লোকই সকল সময় ঐ দুটো গাছের মধ্যে ঐ একই পার্থক্য দেখ্‌তে পাবে—এটাই সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাস। কিন্তু আইনষ্টাইন প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, একজন চলমান মানুষের কাছে ঐ পার্থক্য কম বলে মনে হয়। সেই চলমান লোকের চল্‌বার গতি যতই বৃদ্ধি পাবে পার্থক্যও ততই তার কাছে কম বলে মনে হবে। আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল। যদি একজন মানুষের পক্ষে আলোকের মত অতি দ্রুতবেগে ছুটে চলা সম্ভব হতো—তা' হলে তার কাছে মনে হতো যেন দু'টো গাছ একেবারে গায় গায় লেগে আছে। এ থেকেই বোঝা যায় যে, দূরত্ব বা পার্থক্যের মূল্য সকল অবস্থায়ই এক থাকে না। সুতরাং দশ হাত, পনর হাত

পার্থক্য বা দূরত্ব এ কিছু নয়। গতির সঙ্গে এর মূল্যের একটা সম্পর্ক আছে। গতির সঙ্গে সঙ্গেই এর মূল্যের বৃদ্ধি বা হ্রাস হয়ে থাকে। একে অপরের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ট সম্পর্ক-বিশিষ্ট। এই কারণেই একে বলা হয় আপেক্ষিক (Relative)। তেমনি কোন একটী জিনিষ যদি পাঁচসের ওজন বিশিষ্ট হয়, তবে সকল সময়ই সেই জিনিষটীর ওজন পাঁচ সেরই থাকবে না। যদি একে খুব দ্রুত গতিতে চালানো যায় তবে এর মাত্রা বা জড়মান বৃদ্ধি পেয়ে যাবে। আলোকের মত গতিতে ঐ জিনিষটী চালালে ওর মাত্রা বা জড়মান এত বেশি হবে যে, তা আমরা কল্পনায়ও আনতে পারি না। একজন মানুষ যদি উড়োজাহাজে চড়ে আকাশের দিকে উঠতে থাকে, তখন যদি সেখান থেকে তার চোখ পড়ে পৃথিবীর কোন ঘড়ীর ওপরে—তাহলে সে দেখবে যে পৃথিবীর ঘড়ীটা স্লো চলছে। যদি তখন তার হাতের ঘড়ীতে বেজে থাকে দশটা তা হ'লে পৃথিবীর ঘড়ীতে সময় তার চেয়ে কম হবে। আলোকের মত দ্রুতগতিতে উড়োজাহাজটা যদি ছুটতে পারে তবে সময় খুবই কম মনে হবে। তোমরা হয়ত কথাগুলো শুনে মনে মনে ভাবছো এগুলো সব ফাঁকী —চোখের ধাঁধাঁ মাত্র। কিন্তু সত্যি সত্যি তা নয় আইনষ্টাইন রীতিমত পরীক্ষা দ্বারা এগুলো বুঝিয়ে দিয়েছেন।

কতটুকু গতির সঙ্গে কতটুকু মাত্রা বা জড়মানের, পার্থক্য বা দূরত্বের এবং সময়ের হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় তা-ও তিনি পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়েছেন। আইনষ্টাইনের মোট কথা হলো এই যে, মাত্রা বা জড়মান দূরত্ব বা পার্থক্য এবং সময় সকল অবস্থায়ই একরকম থাকতে পারে না—এর সম্পর্ক গতির সঙ্গে। এই আশ্চর্য্য ব্যাপারটা আবিষ্কারের পর থেকে আইনষ্টাইনের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এ ছাড়াও বিজ্ঞানের আরও বহু নূতন তথ্য তিনি আবিষ্কার করেছেন।

আলবার্ট আইনষ্টাইন স্থইজারল্যাণ্ডের জুরিচ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। শিক্ষা শেষ করে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েই তিনি পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষণা আরম্ভ করেন। পরে সেখান থেকে প্রেগ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হয়ে আসেন। প্রেগ থেকে তিনি প্রাশিয়ার বিজ্ঞান পরিষদে যোগদান করেন। সেখানেও তিনি গবেষণা করতেন। বর্ত্তমানে কোন বিশেষ কারণে সে পদও তাঁকে পরিত্যাগ করতে হয়েছে।

—শেষ—